বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রথম প্রকাশ
২০ মে ১৯৯৩
দ্বিতীয় সংস্করণ
২০ মে ১৯৯৬

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক
লেজার ইম্প্রেশন্‌স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

নিবেদন

বাংলা উপন্যাসের জন্ম গত শতাব্দে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় উপন্যাস নিতান্তই অর্বাচীন। কিন্তু উপন্যাস-শিল্প অতি দ্রুত মুকুলিত বিকশিত হয়েছে। বিশ্বের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলা উপন্যাস। বৈচিত্র্যে, বহুমুখিতায়, জীবনদর্শনের গভীরতায় এবং সমাজজিজ্ঞাসার প্রতিফলনে বাংলা উপন্যাস আমাদের গৌরবের সামগ্রী। বাংলা প্রথম উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' কলকাতা ও মফস্সলের বাঙালির পরিবর্তমান জীবনের চিত্র অঙ্কনে সাফল্য অর্জন করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে এই শিল্পের সিদ্ধি ও পরিণামরমণীয়তা। বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাস-শিল্পের নির্মাণ আর সৃষ্টির পথিকৃৎ। তারপর একে একে এসেছেন দক্ষ আর প্রতিভাবান শিল্পী। ধীরে ধীরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে উপন্যাস-শিল্প। সেই সঙ্গে উপন্যাসে উঠে এসেছে নিম্নবর্গের জাগরণের, আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিকথা বা উপকথা বা চরিতমানস।

উনবিংশ শতাব্দ থেকে বাঙালির সামাজিক অবস্থানের ছকও পরিবর্তিত হয়েছে মৃদুমন্দ গতিতে। ঔপনিবেশিক পরিবেশে বাঙালি বারে বারে আন্দোলিত হয়েছে। একদিকে ছিল তার অতীতের প্রতি টান অন্যদিকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কখনও সে জীবনযুদ্ধে বিজিত কখনও বিজয়ী। এই টানাপোড়েনে ঔপন্যাসিকবৃন্দ যে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছেন তার জটজটিলতাগুলি ধরা পড়েছে তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রে, গল্পের বয়নে। অতৃপ্ত, অসুখী মানুষ কেবলই মারের সাগর পাড়ি দিতে চেয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সন্তানসন্ততির চিরযাত্রার কাহিনী উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। অসংখ্য গ্রামপরিবৃত দেশ নগরমুখী হতে চেয়েছে, আর নগর ঢুকে পড়তে চেয়েছে গ্রামে। ফলে দেখা দিয়েছে সংঘাত। আবর্তের পর আবর্ত। কখনও তা প্রকাশিত কখনও অন্তঃশীলা। একদিন আবর্তিত জীবন মোহানায় গিয়ে মিশেছে। উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে এই মানুষ।

উপন্যাস সামাজিক দলিল। সেদিক থেকেও এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কালের চিহ্ন উপন্যাসের শরীরে। কালের প্রবাহে জীবনযাপনের ভাঙচুর, সূক্ষ্ম টানটোন উপন্যাসে উঠে আসছে।

আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজনে, এই শিল্পের মহিমা উপলব্ধি করা জরুরি। বাংলা আকাদেমি একালের বিশিষ্ট উপন্যাস-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি সেই সব কথা ভেবেই প্রকাশ করছে। বইটির প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। আগের মতো এই বইখানিও পাঠকসমাজের সমাদর লাভ করবে বলে বিশ্বাস করি।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

২০ মে ১৯৯৬

মুখপাত

'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-এর পর আমি আবার এ বই লিখলাম কেন অন্তত নিজের কাছেও সে কৈফিয়তের দরকার আছে। একি বাংলা উপন্যাসের একটি হাতবই? না। আমি আলাদাভাবে কিছু কথা ভাবতে চেয়েছি। দেবেশ রায়, অশ্রুকুমার সিকদার, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিন পাল, ধীমান দাশগুপ্ত, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখের উপন্যাস-ভাবনা আমাকে নানাভাবে ভাবিয়েছে ও তাড়িত করেছে। আমি সেই প্রেরণায় কখনো কখনো নিজের ভাবনাকে যাচাই করে নিতেও চেয়েছি এই বইয়ে।

যাঁরা আমাকে কোনো কোনো দিকে পাণ্ডুলিপি নির্মাণে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সুপর্ণা ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী স্বাগতা দাস মোহান্ত একটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় আমাকে উচ্চকিত করেছিলেন—সেকথা প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি। আন্তরিক ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে।

৮৭, অরবিন্দ রোড
নৈহাটি / ৭৪৩১৬৫
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
২০ মে ১৯৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে এবং পাঠকসাধারণের আনুকূল্যে এই বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হল। উভয়কেই লেখক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্ভাব্য স্থলে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২০.০৫.৯৬

বিনীত
লেখক

উৎসর্গপত্র

কন্যাপ্রতিমা চন্দনা ভট্টাচার্যকে

এবং

ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়কে

বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ

বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ

কোনো দেশেরই সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসধারা ততদিন পর্যন্ত দেখা দেয় না, যতদিন পর্যন্ত না সে অনিবার্য হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না সমাজে অনুভূত সমস্যা এবং শিল্পের দায় খুব কাছাকাছি এবং প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠছে, যতদিন না গদ্যের শক্তি সামর্থ্য ও ভারবহন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন উপন্যাস সাহিত্য স্বরূপে মূর্তি পাবে না। পক্ষান্তরে ব্যক্তিচরিত্র ততক্ষণ উপন্যাসের বিষয় নয়, যতক্ষণ সে পটভূমিকায় লীন। যে মুহূর্তে, অথবা যেদিন থেকে ব্যক্তি তার অস্তিত্বের মূল স্তম্ভগুলিকে নানা জিজ্ঞাসার বিষয় করে তোলে সেদিন থেকে সে হয়ে ওঠে উপন্যাসের বিষয়। ঔপন্যাসিকের চরিত্রাঙ্কন এক ধরনের চরিত্রকল্পনা। কিন্তু নাটকীয় চরিত্রকল্পনা ও কাব্য-কাহিনীর চরিত্রকল্পনার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের চরিত্রকল্পনার স্তরগত পার্থক্য আছে। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তির সমাজপট ও ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যকে আশ্লিষ্ট করা। সে চরিত্র যদি শুধু নাটকীয় অর্থে গতিশীল হয়, অথবা কবিতার অর্থে কল্পনাসম্ভব হয়, তা হলে তার সমগ্রতা—যা ঔপন্যাসিকের প্রধান অনুসন্ধেয়—তা খণ্ডিত হয়। এ জন্যই আমরা 'কপালকুণ্ডলা'র মতো অনবদ্য সৃষ্টিকে যতখানি রোমান্স বলব, ততখানি উপন্যাস বলব না। কিন্তু বিনোদিনী-কেন্দ্রিক 'চোখের বালি' অবশ্যই পুরোদস্তুর উপন্যাস। সমাজ ও পরিবারের একটা সংকট সমাকুলতায় সেই সমস্যাকে কীভাবে শিল্পায়নে উন্নীত করা যাবে—এটাও একটা সমস্যা। জীবন ও শিল্পের সে যুগ্ম সমস্যাকে ঔপন্যাসিক যুগপৎ ধারণ করতে প্রয়াসী।

প্রাচীনযুগ অথবা মধ্যযুগ—সবসময়েই বাস্তব জীবনকথা সম্বন্ধে আগ্রহ ন্যূনাধিক বজায় ছিল। নিষিদ্ধ প্রেম সম্পর্কে চিরদিনই পাঠক আকর্ষণ বোধ করেছে। বাস্তবের অনুষঙ্গ রক্ষা করার জন্যই সেক্ষেত্রে নিপুণ বাস্তব বর্ণনার সাহায্য নিতে হয়েছে। আর গদ্য সেক্ষেত্রে হয়েছে প্রকাশের অনিবার্য বাহন। এগুলিই উপন্যাসের পূর্বসূরি। অন্যদিকে রাব্‌লের (**Rabelais**—আনুমানিক **১৪৯০-১৫৫৩**), **'পাঁতাগ্রুয়েল' (Pantagruel—১৫৩২)**, **'গার্গাঁতুয়া' (Gargantua—১৫৩৪)**, বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস' (১৬৭৮) ইত্যাদি গদ্য-কাহিনীকে

উপন্যাসের পূর্বপুরুষ হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। উপন্যাসের পূর্বগ পরম্পরা সন্ধানে রোমান্সের কথা ওঠেই। রোমান্স আমাদের বিস্ময়ান্বিত করতে চায়। কিন্তু এর উদ্ভব মহাকাব্য থেকেই। এ কথার প্রমাণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, আরব্য কাহিনীর সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্রযাত্রার মধ্যে অডিসি-র ইউলিসিসের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বেশ কিছু উপাদান রয়ে গেছে। এদিকে) আবার ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্মোলেট (Smollett Tobias George—১৭২১-'৭১ এপিক থেকে রোমান্সে বিবর্তনের ব্যাপারটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতের সারাংশ এইরকম, মহাকবির কল্পনামহিমা 'আঁধার যুগে' (dark-age) হারিয়ে গেল। তখন রোমান্স রচয়িতারা আশ্রয় করলেন উদ্ভাবন-দক্ষতাকে। এটা করতে গিয়ে তাঁরা সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করলেন আরিস্তোতল-কথিত সম্ভাব্যতার সূত্রকে।

এইভাবে এগোতে এগোতেই গদ্য-কাহিনী মহাকাব্য ও রোমান্স অপেক্ষা একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ অন্বেষণ করেছিল। লেখক যখন পাঠককে অভিভূত করার জন্য পাঠকের বিশ্বাস অর্জন করার ব্যাপারে চেষ্টা করতে শুরু করেছেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি একটা নতুন শিল্পরূপের আভাস পাচ্ছেন। 'লেটার্স অন শিভ্যল্‌রি অ্যাণ্ড রোমান্স' (১৭৬২) গ্রন্থে দশম পত্রে হার্ড একটি কথা বলেছিলেন। তার তাৎপর্য হল, অবিশ্বাস্য বিষয় আমাদের অভিভূত করতে পারে না। অতএব বিশ্বাস আকর্ষণের জন্য বাস্তবকে যথাযথ বর্ণনা করতে হবে—এই বোধ তার আগেই বারে বারে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাস্তবের চাপ বাড়তে বাড়তেই দেখা গেল, উপন্যাস সবকিছুকে গ্রহণ করে চলে। সার্থক শিল্পীর জানা আছে যে, মানুষের অন্তর্মুখিনতা বা হৃন্ময়তা কবিতার বিষয়, তার দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব নাটকের বিষয়। আবার এটাও তাঁর জানা আছে যে, সেই হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে সামাজিক মানুষের সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে গেলে উপন্যাসের অগ্রাধিকার। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে—The novelist has been quicker than the poet or the pailosopher to borrow their specialities, than they have to borrow his : শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরচয়িতা সর্বত্রচারী। মানব-মনীষার অন্যতম প্রধান দান দর্শন মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব সে অঙ্গীকার করে। সাহিত্য শিল্পের প্রত্যেকটি শাখা, অর্থাৎ কবিত্ব, নাট্যরস, কাহিনীরস—সবকিছু থেকেই উপন্যাস ঋণগ্রহণ করতেও পারে। উপন্যাস একাধারে গদ্য রোমান্স ও পিকারেস্ক জাতীয় রচনার উত্তরাধিকারকে একত্র

করেছে। জীবনের রূপান্তরশীলতার দিকে অনন্যদৃষ্টি রেখে চলতে চলতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে আধুনিকের হাতে রচিত কালের গদ্যময় প্রতিমা। কিন্তু এ উত্তরাধিকার বহন করা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সহজ কাজ নয়। নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কখন কাজে লাগবে, কখন কার্যসিদ্ধি ঘটবে কবিত্বময় বর্ণনায়, তা জানতে পারেন একমাত্র উপন্যাসের জটিল অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত লেখক। ঔপন্যাসিককে তাই হতে হয় সর্ব-রসসিদ্ধ। উপন্যাস-পাঠককেও হতে হয় সর্ব-রস-ভোক্তা। হাতে সমস্ত শক্তির ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে বলেই কিন্তু যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার ঔপন্যাসিকের নেই। অসময়ে নাটক পরিহার করে অকস্মাৎ কবিত্বময় বর্ণনার আশ্রয়গ্রহণ অন্যায়। তেমনি যেখানে শুধু একটা বিশদ বর্ণনাতেই কাজ মিটতে পারে, সেখানে গুরুগম্ভীর নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা অযৌক্তিক। এগুলি উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকবিন্যাস সম্বন্ধে লেখকের সীমিত জ্ঞান ও দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

উপন্যাসের শিল্পমহিমার যে একান্ত স্বাতন্ত্র্য, তার মধ্যেই আছে উপন্যাসের এই কাব্য-রস, কাহিনী-রস এবং নাট্য-রস—সকলকে একাধারে সমন্বিত করার প্রচণ্ড শক্তির মূল। উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। দ্বন্দ্বময় চরিত্রসৃজনে সফল হলে ভালো নাটক সৃজিত হয়। অনুভূতিকে চিত্রকল্পময় করতে পারলে কবিতার প্রাথমিক সাফল্য আসে। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে যদি সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করা না যায়, তবে উপন্যাস ব্যর্থ। জীবনের গোটা রূপ উপন্যাসরচয়িতার ধ্যানের সামগ্রী। জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের কথাটি মনে রেখেই উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হেন্‌রি জেম্‌স্‌ তাঁর সুবিখ্যাত 'Art of Fiction' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> As people feel life, so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel.

জীবনকে মানুষ যেভাবে অনুভব করবে, জীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ এই শিল্পকেও সে অনুভব করবে। উপন্যাস আলোচনাকালে এই সম্পর্কের নিবিড়তার কথা ভুলে গেলে চলবে না।

উপন্যাস জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবনের এই আত্মীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে ঔপন্যাসিক জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন। এই সামগ্রিকতা ব্যতীত কখনও সার্থক উপন্যাস সৃষ্ট হতে পারে না। ইউলিসিস পর্যন্ত যে ক'টি

সার্থক উপন্যাসের কথা আমরা স্মরণে আনতে পারি, সকল ধরনের এবং সকল বিষয়ের উপন্যাসের প্রধান কথা এই সমগ্রতা। ডিকেন্স, জেন অস্টেন প্রমুখের রচনায় এই সমগ্রতার সন্ধান নিশ্চয় উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সন্ধানের অধিকতর সার্থক রূপ তখনই সৃজন করা যায়, যখন ঔপন্যাসিকের নির্ভীক নিরাসক্তি জীবনানুসন্ধানে লেখককে পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত করে তোলে (স্তঁাদাল এবং বাল্‌জাককে আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি)। ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের Surface respectability-র যুগে এই নির্ভীক নিরাসক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। হার্ডির চরিত্রকে যখন আমরা কবিত্বময় প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখলাম কিংবা 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর আশ্চর্য বাস্তবতাবোধের অবান্তর স্নিগ্ধ পরিসমাপ্তি আর এরই পাশাপাশি যখন আমরা দস্তয়েভ্‌স্কির (যাঁর উপর নাকি ডিকেন্সের প্রভাব বিদ্যমান) 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'-এর নায়কের যন্ত্রণার কথা ভাবি, অথবা 'রেজারেক্‌শন্‌'-এর নেখ্‌ল্যুডফ চরিত্রপ্রসঙ্গ চিন্তা করি, একমাত্র তখনই এই নির্ভীক নিরাসক্তির ব্যাপারটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। উপন্যাসে আসক্তির অর্থ আংশিকতা।

এই নির্ভীক নিরাসক্তির ফল কিন্তু বাস্তবের স্থূল বর্ণনার আতিশয্য নয়। তা-ই যদি হবে, তা হলে আমরা নিশ্চয় ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুতার প্রেক্ষাপটে জোলা-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতাম। কিন্তু আমাদের জানা আছে, এ প্রসঙ্গে জোলা-র গুরুদেব ফ্লবেয়ার-এর কথা যদি বা উত্থাপিত করা যায়, জোলা কিছুতেই নয়। সামগ্রিকতা মানে totality of objects আর totality of objects মানে cataloguing of details নয়, কেবলমাত্র পরিধিগত পৃথুলতাও নয়। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধের বৃত্তটি পূর্ণ হয়ে উঠতে পারল কি না এটাই প্রধান কথা। উপন্যাসকার যে জীবন আমাদের সামনে উপস্থিত করেন, সে জীবন সামগ্রিক এইজন্য যে, সে জীবন সৎ নয়, অসৎ নয়, শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ নয়, নীতিগ্রস্ত নয়, নীতিদুষ্ট নয়। সে জীবন হল সেই মানসোৎসুক হংস, যে সর্বদা উত্তীর্ণ হতে চাইছে। সে জীবন সেই সীতা, যে বারে বারে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় দেবে, কিন্তু পরীক্ষার কখনও শেষ হবে না। এই সমগ্র জীবনকেই অডিসি, ইলিয়ড, রামায়ণ, মহাভারতের মহাকবিরা একদিন ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আশ্চর্য উপলব্ধির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যে এখনও স্তম্ভিত হয়ে যাই, তার কারণ এই সর্বতোমুখী সমগ্রতা। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান, তিনি পত্নী-

পুনরুদ্ধারের জন্য বালীবধ করেন। মানুষের এই পরীক্ষাই প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনের সামগ্রিকতার পরীক্ষা। যিনি এতে উত্তীর্ণ হন, তিনি সেকালে মহাকবি—একালে মহৎ ঔপন্যাসিক। তাই বলা যায় যে শুধু অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শন এই সামগ্রিক বোধের জন্ম দিতে পারে না। সামগ্রিক বোধ একমাত্র তখন সৃজিত হতে পারে যখন ঔপন্যাসিকের জীবন-অভিজ্ঞতা একটা নৈতিক সচেতনতায় শেষপর্যন্ত মণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর্নল্ড কেট্‌ল্ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী—এ কথা নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, উপন্যাসে থাকা চাই জীবন এবং জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ দুই-ই।

জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিকবোধ শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাসবোধকে তোষণ করা নয়, শুধুমাত্র আমাদের বাস্তবজ্ঞানের সম্প্রসারণ অথবা আমাদের কল্পনা-বৃত্তির পরিচর্যা এর লক্ষ নয়। জীবনের কাব্য, নাটক, কাহিনী, আলেখ্য সমস্ত-কিছুকে কুক্ষিগত করে এই সামগ্রিকবোধ গড়ে ওঠে। সেই সমগ্রতাবোধের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের অশেষ সম্ভাবনাকে উপন্যাসে রূপায়িত করা। এ কারণে উপন্যাস কখনও realism—naturalism ইত্যাদি পুথিনির্দিষ্ট ছককে অনুসরণ করে না। জীবনের কোনো ছক নেই। তাই উপন্যাসকেও তার এই সামগ্রিকতার জন্য কোনো ছকে ফেলা চলে না। টল্‌স্টয়, দস্তয়েভ্‌স্কি, টোমাস মান্ প্রমুখ মহৎ শিল্পীদের রচনায় আমরা যে সামগ্রিকতার দেখা পাই, তা কোনোরকম ছক, পূর্বপোষিত মতাদর্শ বা dogma-নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠেছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট আগ্রহ কোনো সূত্রনির্ভর হতে পারে না।

চরিত্রের মাধ্যমে অবশ্যই ঔপন্যাসিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণার কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু এই ধ্যানধারণা যেহেতু উপন্যাসের সমগ্রতার ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেহেতু আরও নানা কিছু এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের দরকারি হয়ে পড়ে। সেগুলি হল ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা। উপন্যাসকার তাঁর সবটুকু প্রচেষ্টার সাহায্যে অবশ্য প্রাথমিকভাবে পাঠকের জীবনসম্বন্ধে কৌতূহলের নিবৃত্তি সাধনে প্রয়াসী হন। কিন্তু বহুবিচিত্র বলে জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলেরও কোনো শেষ নেই। এই কারণে একই বিষয় নিয়ে দুই লেখকের রচনা দুই ভিন্ন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন করে। অন্তহীন এই জীবনের অনন্ত রূপ বারে বারে ঔপন্যাসিককে আহ্বান জানায় জীবনের গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। ঔপন্যাসিকের মন সেই বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যের ব্যবহারে জীবনের একটা সমগ্র অর্থ সৃজন করে। তা শেষপর্যন্ত উপন্যাসকে একটা জীবনদর্শনে

পৌঁছিয়ে দেয়। ঔপন্যাসিক এই জীবনদর্শন সৃষ্টি করেন জীবনের আকাঁড়া তথ্যগুলি অবলম্বন করে। অতএব লেখকের মন, সেই মনের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি একটা সার্থক উপন্যাসের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে। হেন্‌রি জেম্‌স্‌ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, উৎকৃষ্ট মন উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপায়িত হতে পারে—The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer। এখন শিল্পীমনের সেই গভীর মনীষার পরিচয় আমরা উপন্যাসের ভিতরে কীভাবে সন্ধান করি, উপন্যাসের সমগ্রতা ও তার pattern-এর বিচার প্রসঙ্গে সে কথাটি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি উপন্যাস শিল্পীর অন্তরাত্মার প্রতিফলন। তাই উপন্যাসের শিল্পবিচারের সময় আমাদের পাঁচটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়—এক. জগৎ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে শিল্পী কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন ; দুই. কোন্‌ ব্যাপারটি তিনি গভীর-ভাবে অনুধাবন করেন ; তিন. তিনি কী পরিহার করেছেন ; চার. কোন্‌ ধরনের সমস্যা তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন ; পাঁচ. এই সব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোন্‌ নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন—এই পঞ্চবিধ পরিচয়ের উপরে ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের বিচার হবে।

উত্তম অভিজ্ঞতা বা অধম অভিজ্ঞতা বলে কোনো কথার কিছু মানে হয় না। শেষপর্যন্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবনরসের নিষ্কাশন হবে, স্বভাবত সেটাই প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে প্রধান কর্মকর্তা হল শিল্পীমনের কল্পনাশক্তির উৎকর্ষ। রোমান্টিক কবিদের কাছে কল্পনাই অন্তর্দৃষ্টি। কল্পনাই তাদের উপাস্য ঈশ্বর। ঔপন্যাসিকের কাছে আবার বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা হল প্রধান কথা। এই বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা অথবা লেখকের ঔপন্যাসিক মনীষাকে যে-কোনো স্বাধিকার দিতেই আমরা প্রস্তুত। এটা লেখকের বিষয়বস্তু, মতাদর্শ যে-কোনো ব্যাপারেই দেয়। আমাদের শুধু দেখতে হবে, তিনি তাঁর সমস্ত উপাদানের ব্যবহার করেছেন কীভাবে। তাঁর আহৃত সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত তথ্য ও উপাদান গভীর ও গূঢ় মননের ভিতর দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রবাহিত হয়ে শেষ অবধি একটা pattern পরিগ্রহ করছে কি না, শেষপর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসটি তাঁর সমস্ত জীবন-ধারণার এক বিস্তৃত রূপকের আকার ধারণ করেছে কি না—এটা আমাদের দেখতে হবে। অতএব লেখকের অভিজ্ঞতা—যেটা উপন্যাসের একটা প্রধান ব্যাপার—সেটা আদৌ সাধারণ মানুষের, অভিজ্ঞতা নয়। ঔপন্যাসিকের অপরিহার্য প্রধান শক্তি কোন্‌টি, এই প্রশ্ন যদি কখনও ওঠে, তা হলে সেক্ষেত্রে আমাদের উত্তর কেবলমাত্র

এই হবে যে, অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও মননসমৃদ্ধ কল্পনা ঔপন্যাসিকের ব্রহ্মাস্ত্র। যেহেতু শিল্পমাত্রেই শেষপর্যন্ত নিপুণ ও অভিনিবিষ্ট নির্বাচন, সেহেতু উক্ত কল্পনা এ বিষয়ে ঔপন্যাসিককে—তার অন্তর্দৃষ্টিকে সাহায্য করে। তাই বলা হয়, যে মন কৃত্রিমতায় পূর্ণ, যে মন পল্লবগ্রাহী, সেই মন কখনও উৎকৃষ্ট উপন্যাসের স্রষ্টা হতে পারে না। ঔপন্যাসিকের মন কবির মতো শুধু কবিত্বেই আসক্ত নয়, নাট্যকারের মতো শুধু নাট্যরসেই তার পক্ষপাত নয়, সেই মন জীবনের সত্যকার সহজ স্বাস্থ্যের অধিকারী;বলে জীবনের কাব্যে-কাহিনীতে-নাট্যে, তুচ্ছ এবং উচ্চ, নীচ এবং মহৎ, সুন্দর এবং কদর্য সকলের রূপসাধনা করতে পারে। এই বিচিত্র রূপসাধনা প্রকৃতপ্রস্তাবে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব রসসাধনা। এ রসসাধনার লক্ষ্য জীবন-অন্বেষণ। এই জীবন-স্বরূপই সামগ্রিকতা।

জীবনকে জীবনের মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করানোর অনুজ্ঞা ঔপন্যাসিককে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। এরই আরেক নাম বাস্তব ও জীবনের মায়া (illusion) সৃজন। কেমনভাবে এই মায়া সৃষ্ট হয়, তা জটিল সৃষ্টিক্রিয়ার অন্তর্গত ব্যাপার। সে কারণেই এটা খানিকটা দুর্জ্ঞেয়ও বটে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেই মতারণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। রিয়্যালিজম্‌, ন্যাচারালিজম্‌ প্রভৃতি নানা ইজমের প্রবক্তারা যেখানে নানা মতবাদী বক্তব্য নিয়ে সদ্য প্রস্তুত, সেখানে দিশাহারা হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

ঔপন্যাসিকের এই শিল্পকৌশলের মূলে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নির্বাচনী ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্র, মিলিউ, প্লট এবং ঘটনাংশ সবকিছুতে লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। আধুনিক জীবন এবং সভ্যতার সমস্তকিছুই পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ ও সংযুক্ত। তাই লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ভিতরে সেই শক্তি রয়েছে, যা ঘটনা চরিত্র এবং খুঁটিনাটি বিষয় ও বিষয়াংশের নির্বাচনে জীবনের সমগ্র রূপকে আভাসিত করে তোলে। উপন্যাসের বর্ণনাংশের যেসব ছোটো ছোটো কাজের উপর জীবনের মায়াসৃজন নির্ভর করে থাকে, সেগুলি লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ফল। এই নির্বাচনী ক্ষমতা নিশ্চয়ই লেখকের সচেতন প্রয়াস, তবে তা উপন্যাসধৃত সমগ্রতার সঙ্গে অন্বিত। যে বিশিষ্ট জীবনবোধ লেখকের সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থা গড়ে তুলেছে, এই নির্বাচনী ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে তার সন্তান। পরিবেশ ও পরিবেশধৃত মানুষকে উপলব্ধির ব্যাপারে লেখকের মনীষা কতখানি সাহায্য করেছে, এই নির্বাচনী ক্ষমতার দ্বারা তা-ও প্রমাণিত হয়। এই নির্বাচনী ক্ষমতা শিল্প ও জীবন—এই দুই কূলে সমদৃষ্টি রেখে চললে কখনও যাত্রা-

ভ্রষ্ট হয় না। জীবনে মায়াসৃজনের রহস্য মোটামুটি এইরকম। একজন অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন শিল্পী জীবনকে তাঁর শিল্পের রূপকে যখন ধরতে চান, তখন এই নির্বাচনী ক্ষমতাতেই তাঁর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। তাঁর প্রধান পরিচয় অবশ্যই অন্যত্র। সে কথা স্থানান্তরে আলোচ্য।

মহাকাব্যের মতো সার্থক মহৎ উপন্যাসও শান্তরস পরিণামী। উপন্যাস পাঠের ফলে পাঠকচিত্তে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের গভীরতা বাড়ে, ব্যক্তি-জীবনের কামনা-বাসনাকে সুবৃহৎ পটভূমিতে স্থাপিত দেখে তাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের হ্রাস হয়। তখন আমরা উদার সহিষ্ণু চিত্তে জীবনের অগাধ অসীমতা সম্বন্ধে সজাগ হই। চিত্তে শমভাবের সঞ্চার সার্থক উপন্যাসের শিল্পকুশলতার লক্ষ্য। একজন সার্থক ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও তার ব্যবহারে সে কারণেই আবিষ্টতা পরিহার করে চলেন। যে বিষয়, যে ভাষা, যে রচনারীতি বা ঘটনাসংস্থান লেখক নির্বাচন করেন, সে সমস্তকিছুই আসলে একস্থানে এক আধারে এসে সংহত হয় লেখকের জীবনসম্বন্ধীয় বক্তব্যের আকর্ষণে। এই বক্তব্যই ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ—একে তিনি আহরণ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতায়, সঞ্চয় করে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিতে, গড়ে তুলেছেন তাঁর কল্পনায়, তাঁর মননে। ব্যক্তিস্বরূপের সতত আবিষ্কারের এই নিরলস সাধনায় নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর সাধনপীঠ। তাঁর জীবনার্থও জীবননির্ভর। এ প্রসঙ্গে লরেন্সের বক্তব্য সকল উপন্যাস-রস-সন্ধানীর দিশারি। লরেন্স 'Why Novel Matters' নামক প্রবন্ধে বলেছেন :

> আমি এখন এটা মূলেস্থূলেই অস্বীকার করছি যে, আমি একটা আত্মা, অথবা দেহ অথবা মন কিংবা বুদ্ধি, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুক্রিয়া, কী কোষপুঞ্জ কী এই ধরনের আর কিছু। সমগ্র সর্বদাই অংশের থেকে বড়ো। সে কারণে আমি জীবন্ত মানুষটা আমার আত্মা দেহ মন চেতনা বা আমার যেকোনো অংশের থেকে বড়ো। আমি জীবন্ত মানুষ। যতদিন পারব ততদিন আমি জীবন্ত মানুষ থাকতে চাই। এই কারণেই আমি ঔপন্যাসিক।

কবিতার মতো উপন্যাসের ভাষাও স্রষ্টার কল্পনার এক অলিখিত অনুশাসনের সূত্রে বাঁধা। সেখানেও ভাষাব্যবহারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিদর্শন দ্বারা লেখকের ঔপন্যাসিক রস-সন্ধানের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথা প্রমাণিত হয়। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও দর্শনের সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে। বাক্য যোজনায়, শব্দ-ব্যবহারে, বর্ণনায় এবং চিত্রকল্প গঠনে সর্বত্র ঔপন্যাসিকের বৃহৎ কল্পনা ক্রিয়াশীল

বলে সমালোচনায় বহুধাবিস্তৃত ব্যবহারে এরাও নতুন নতুন তাৎপর্যের দ্যোতক। এবং উপন্যাসের ভাষার এই ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার সময়ে হার্ডির মতো বিধুর কবিপ্রাণ ঔপন্যাসিকই যে আলোচনার বিষয়ীভূত হন, তা নয়—ডিফো-র মতো গদ্যময় অথবা কন্‌রাডের মতো এপিকলক্ষ্য ঔপন্যাসিকও এই ধরনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। আসল ব্যাপার হল, উপন্যাস যদি শুধু গল্প বা কাহিনীমাত্র না হয়, বালিকা কিশোরীদের অবসর বিনোদনের বিস্ময়বিলাস না হয়ে সে যদি সার্থক শিল্পসৃষ্টির কাছাকাছিও যেতে চেষ্টা করে—উৎকৃষ্ট রসকল্পনা এবং শিল্পগত নৈতিক দীপ্তি যদি উপন্যাসের অভিপ্রায় হয়, উপন্যাসের ভাষায় তখন একটা অখণ্ড কল্পনার ছাপ পড়বেই।

বঙ্কিমের গদ্য মানুষের কর্মময় দৈনিকের চিত্র অঙ্কনে পরাঙ্মুখ। সে গদ্য মানুষের আটপৌরে চেহারা আঁকতে চায় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসের কথা মনে রেখেও বলতে হয় যে, 'কপালকুণ্ডলা'র পরিবেশে এই উন্নীত গদ্য যতখানি স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে, ততখানি বোধ হয় আর কোথাও হয়নি। এই রচনায় বঙ্কিমের গদ্য ও কল্পনা যে সাযুজ্য লাভ করেছে, বঙ্কিমের উপন্যাসের অন্যত্র তা দুর্লভ। বাস্তবিক, পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস-গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় প্রধান ত্রুটি বলে একটা ব্যাপার পরিগণিত হবে। সেটা হল, আমাদের আটপৌরে জীবনযাত্রাকে সে ভাষা চিত্রিত করতে পারেনি। উনিশ শতকের আপিস-আদালতের কথা দূরে থাক, একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক অথবা তার ঘাত-প্রতিঘাতকে বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর এড়িয়ে চলেছেন। মানুষের গদ্যময় রূপ, তার কর্মিষ্ঠ চেহারা বঙ্কিমের কল্পনাকে স্পর্শ করত না। আসলে ডিফো-ফিল্ডিং-এর পর্যায় বাদ দিয়ে আমরা একেবারে রোমান্টিক পর্যায় থেকে শুরু করেছি। এর ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছে যে, মানুষের হৃদয়গত ভাববৈষম্যের বর্ণনায় বঙ্কিমি কল্পনা ও ভাষা যে-পরিমাণে সার্থক, বিরলরেখ জীবনের বর্ণনায় তা সেই পরিমাণেই বিফল। বঙ্কিমের যুদ্ধ-বর্ণনা যে পরিমাণে সার্থক, গৃহস্থালি-বর্ণনা সে পরিমাণেই ব্যর্থ। সে সময়ের অন্য ঔপন্যাসিকের প্রসঙ্গ এই সূত্রেই উঠতে পারে। সে যুগের কর্মময় মধ্যবিত্তের কথঞ্চিৎ পরিচয় রমেশচন্দ্র দত্তের সামাজিক উপন্যাসদুটিতে পাই। কিন্তু রমেশ দত্তের ভাষা, কল্পনা ও তার গদ্য আমাদের কল্পনা এবং প্রত্যয় কিছুই উৎপাদন করে না। এমনকী রমেশ দত্তের নানাবিধ প্রগতিশীল চিন্তা সত্ত্বেও 'ইন্দিরা' আমাদের কাছে প্রিয়তর গ্রন্থ। কারণ রমেশ দত্তের বাচনিক প্রগতিশীলতা

ঔপন্যাসিকের কল্পনার বিশুদ্ধ গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়নি। শেষপর্যন্ত 'সংসার' ও 'সমাজ' কেরিয়াররমুখী বাঙালি যুবকের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। 'গ্রামে থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই'—এ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও নয়, সামন্ত-কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও নয়। সরল চাকুরিপ্রাণ মধ্যবিত্তের সহজ স্বীকারোক্তি। এভাবে 'সংসার' ও 'সমাজ' রমেশ দত্তের নৈতিক দীপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে উপন্যাসের কল্পনা ও ভাষাকে সীমিত ও স্তিমিত করেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিম রমেশ দত্তের মতো 'সংসার' ও 'সমাজ' অথবা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো স্বর্ণলতা না লিখলেও নতুনকালের চিন্তায় ধৃত মানুষের যন্ত্রণাকে ধরতে চেয়েছিলেন। সে যন্ত্রণা তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল বলে তার বর্ণনায় বঙ্কিমি গদ্য কাব্যের প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বিষবৃক্ষ'-এ হীরার কবলে পড়বার আগে কুন্দর বিহ্বলতার বর্ণনা লক্ষ করার মতো :

> অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়নপথের আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।
>
> তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সার্সী বন্ধ—অন্ধকার-মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধ পথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

অথবা—

> রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরো কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরো কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমাত্র কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্কে থাকিয়া তাহার আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে।

অথবা—

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া কুন্দনন্দিনী উঠিল।…নিশাচর পিশাচ ঝাউগাছের সর্‌সর্‌ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর্‌তর্‌ শব্দ করিয়া বলিল "কোথায় যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।"

এই অংশের বর্ণনাভঙ্গির সবকিছু লক্ষ করবার মতো। এর ভাষা ও চিত্রকল্প দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন ঘন দ্বিরুক্তি, কাটা কাটা বাক্যবিন্যাস, কুন্দনন্দিনীর প্রায়-অপ্রকৃতিস্থতার পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম। বঙ্কিমের গদ্যে এসব ক্ষেত্রে প্রায়শই কাব্যের স্পন্দন আসে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির তৃতীয়াংশের গদ্য পদ্যচ্ছন্দের অনেকটা নিকটে চলে এসেছে। প্রথমাংশের 'অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল' কুন্দ-পরিকল্পনার মৌল ধারণার উপযুক্ত চিত্রকল্প। পতঙ্গের ব্যঞ্জনাও সাধারণের চোখে পড়বে। সর্বোপরি প্যাথেটিক ফ্যালাসির ব্যবহার সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলিতেও এর চেয়ে অধিক সুপ্রযুক্ত কোথাও হয়নি। মনে হয় যেন একটা ঘনবদ্ধ কবিতার যথাবিহিত পরিণতিতেই এটা এসেছে।

উপন্যাসের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয়—সর্ববিধ বিষয় এবং সর্বস্তরের মানুষ তথা এর বিস্তৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত ভাষাই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা। জীবন সম্বন্ধে লেখকের ইতিবাচক মনোভাব, জীবনের নৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতাই উপন্যাসে উক্ত বিষয় ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণে দৃঢ়তা সঞ্চারিত করে। আবার এই দৃঢ়তা ভাষার ক্ষেত্রেও ঘনীভূত হয়ে উপন্যাসকে ভাব ও রূপ—এই দুই দিক থেকেই সার্থকতা দান করে। কীভাবে এটা করে, 'গোরা' তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'গোরা'র প্রধান গুণ এর বিশাল পরিসরের সর্বত্রব্যাপী সুষমতা। উপন্যাসের কল্পনা, ভাষা, ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ—সর্বত্র ঔপন্যাসিকের সামঞ্জস্যজ্ঞান শেষাবধি সমুপস্থিত। এ উপন্যাসের ভাষার মৌলসত্তাটি চলিষ্ণু। আখ্যানের পরিণামী গতি ও চরিত্রগুলির গভীরতা অর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ভাষা শব্দে চিত্রকল্পে অবয়বসম্পন্না। এই সর্বত্রব্যাপী সুষমতার মূলে সক্রিয় 'গোরা' উপন্যাসের মৌল পরিকল্পনা। কাব্যিক মানুষ বা নাটকীয় মানুষ নয়, দেশকালের বিচিত্র বিন্যাসে ধৃত গোটা মানুষকে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের পটে ধরতে চেয়েছেন। ফলে কবিত্ব ও নাটকীয়তা ভাষাবিন্যাসের এ দুয়ের কোনোটিই

একক প্রাধান্য পায়নি। 'গোরা'র গদ্যরীতির প্রধান গুণ এই যে, উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে এ একেবারে একাত্ম। তাই আমাদের মনোযোগের অন্যান্য অংশকে ছাড়িয়ে এ ভাষাবিন্যাস কখনোই আধিপত্য দাবি করে না। উপন্যাসের আদর্শ গদ্যরীতিতে এমন নিরাসক্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যে, তার স্থিতিস্থাপকতা বিস্মিত করে। চরঘোষপুরের নাপিত, হরিমোহিনী, কৈলাস, মহিম অথবা সুচরিতা কারও জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই—গোরারই মতো নির্ভীক ও সর্বত্রচারী এই গদ্যরীতি। সেজন্য নাপিতের মুখেও রবীন্দ্রনাথ নিজের গদ্যভঙ্গি তুলে দিতে ভয় পান না। অতি বিশেষীকরণের জন্য অকারণ ব্যস্ততায় উপন্যাসের এপিক মর্যাদাকে খাটো করেন না।

যে কৌশলে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মন্ময় রসে জারিত হয়, সে কৌশল রবীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর কোথাও সাবলীল রূপে প্রকাশিত হয়নি। একই উদ্দেশ্যসাধক নিচের বর্ণনাটি অনুধাবনযোগ্য। এ অংশটি 'যোগাযোগ' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে :

> দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্ন-বিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদবর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমাপরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতম দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানারকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক বল্লম বর্শা।

এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, শুধুমাত্র বিষয়-অনুগামী বিশ্বস্ততাকে বহন করা এর কাজ নয়। তাই এখানে বর্ণিত বিষয়েরও একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র বর্ণনাটিকে নির্বিশেষত্ব থেকে উদ্ধার করে একটা স্বকীয়তা এনে দিয়েছে। এ স্বকীয়তা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ।

উৎকৃষ্ট কবিতার মতো 'গোরা' উপন্যাসের মৌল কল্পনার সঙ্গে ব্যবহৃত উপমাগুলির গভীর যোগের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল বিভিন্ন প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে জল বা নদী কিংবা স্রোত-সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে। উপন্যাসের চিত্রকল্প কবিতার চিত্রকল্প অপেক্ষা সাধারণভাবে কম নজর-ধরা। কবিতায় চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে অনেকসময় কবিতাটি সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা আসে। উপন্যাসে গল্প, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রগতির মাঝে চিত্রকল্প একটি অর্ধপ্রচ্ছন্ন স্রোতের মতো মাঝে মাঝে তরঙ্গ তোলে—মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। কিন্তু নদী বা ঢেউ, কূল বা বন্দরের চিত্রকল্প যদি 'গোরা' উপন্যাসে একবার কি দুবার ব্যবহৃত হত, তা হলে সেটাকে কবি রবীন্দ্রনাথের উদার দান বলেই গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু এই চিত্রকল্প যদি উপন্যাসটির যে-কোনো টেন্‌শনের মুহূর্তে পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়, তখন তা উপন্যাস-সমালোচকের অভিনিবেশের বিষয় হয়ে ওঠে। গোরার চরিত্রই উপন্যাসের কেন্দ্র—রচনাকালে গোরার চরিত্র-কল্পনাই বারংবার বর্ণনায় তার যোগ্য উপমা খুঁজে পেয়েছে। এবং এই কারণে, কেবলমাত্র প্রেমের উন্মেষের দৃশ্য বলে নয়—উদ্ধৃত স্টিমারের অধ্যায় উপন্যাসের মৌল আবহাওয়ায় এতখানি প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছে।

দুই

বাংলা সাহিত্যে উনিশের শতকে এই শক্তিশালী ও সর্বার্থ আগ্রাসী শিল্প-মাধ্যমটি প্রতিষ্ঠিত হল। তার উদয়কালের প্রেক্ষাপটটি এবার আমাদের আলোচ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন থেকে 'বাবু' আর 'ভদ্রলোক' এই দুটি শব্দের শ্রেণীগত তাৎপর্য এবং সামাজিক ভূমিকা ক্রমশ স্পষ্টতা পেতে শুরু করল, যখন থেকে সামাজিক নেতৃত্ব ভূস্বামীদের অধিকার থেকে ধীরে ধীরে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর হাতে চলে আসতে লাগল— তখনই—ঠিক তখনই উপন্যাস সাহিত্য আবির্ভাবের প্রাথমিক শর্তটি পালিত হল; সে শর্তটির মূল কথা—উপন্যাস পাঠকমণ্ডলী বা 'রিডিং পাবলিক'-এর প্রস্তুতি। বিষয়নিরপেক্ষভাবে কোনো প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। এখানেও হয়নি। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতা মহানগরী যত মধ্যযুগীয় গ্রামগুচ্ছের প্যাটার্ন ছিঁড়তে ছিঁড়তে আধুনিক মেট্রোপোলিসের অভিজ্ঞান অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে, ততই ধর্ম আন্দোলনে, সামাজিক সংস্কার সাধনে, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে, সর্বোপরি সাংবাদিকতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বাঙালি

ভদ্রলোক শ্রেণী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার সাবালকত্ব অর্জন করেছে। এই সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে মুদ্রিত ও উৎসাহিত দীর্ঘ পত্রগুলি একটা কথা প্রমাণ করে। গদ্যে লেখা ওই দীর্ঘ পত্রগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণী। সে অভিজ্ঞতা সর্বার্থে সমসাময়িক অভিজ্ঞতা। মুখ্যার্থে তা ছিল বাস্তব জীবনাগ্রহে বিশিষ্ট। পরিস্থিতি তখন দ্রুত পালটে যাচ্ছিল। ব্যবসায়ী বা বেনিয়া শ্রেণী—আমি এখানে আর্থিক শ্রেণীর কথা বলছি—ভদ্রলোক শ্রেণীর কাছে ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছিলেন। রূপান্তরের মুখে বাঙালি সমাজের একটা অংশ তখন 'বাবু' অভিধা অর্জনের জন্য ব্যস্ত। আরেকটা অংশ 'ভদ্রলোক' হওয়ার জন্য ব্যস্ত। প্রথমটি হঠাৎ-বড়োলোক, সুবিধাভোগী শ্রেণী। 'বাবু' অভিধা নিয়েও যাঁরা এই হঠাৎ-ধনী বাবুদের সমুদায় স্ববিরোধ বুঝে নিয়েছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন তা থেকে মুক্ত হতে, তাঁরা ভদ্রলোক। 'বাবু'—ব্যাঙ্গার্থে যাঁদের হুতোম-বঙ্কিম প্রমুখেরা 'বাবু' বলে অভিহিত করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে কম্প্রাদুর স্বভাবাপন্ন। ভদ্রলোক আত্মাভিজ্ঞান সন্ধানী একটা অগ্রণী সম্প্রদায়। 'বাবু' একটা ভঙ্গি, 'ভদ্রলোক' একটা সত্যাভিপ্রায়ী ব্যক্তি। 'বাবু' অভ্যাসিকতার ছকে বাঁধা একটা জীবনাচরণের অন্য নাম। 'ভদ্রলোক' একটা স্বাধীনতাপ্রেমিক সত্তা। যদিও সে সত্তাও আবার ঔপনিবেশিক নানা খণ্ডায়নে পীড়িত। 'বাবু' কোনো অর্থে আধুনিক নয়। 'ভদ্রলোক' আধুনিক। 'বাবু' কথাটি মাত্র পরিচয়জ্ঞাপক, 'ভদ্রলোক' চরিত্রজ্ঞাপক। ইংরেজি ভাষায় 'জেন্টলম্যান' শব্দটি বহুবিস্তৃত অর্থ ও ব্যঞ্জনার অধিকারী। বাংলায় 'ভদ্রলোক' শব্দটি উনবিংশ শতাব্দে দেখতে দেখতে এমনই এক বহুমাত্র এক-শব্দে পরিণত হল। এঁরাই কলকাতাকে কেন্দ্র করে, কলকাতার শিক্ষাচরণকে কমবেশি নিজ নিজ জীবনে মূর্ত করে তুলে একটা ইতোপুর্বে অজ্ঞাত জীবনভাষ্যকে মর্যাদা দিলেন। মফস্‌সল থেকে এঁরা কেউ কেউ এসেছিলেন কলকাতার টানে—তারপর কলকাতা থেকে তাঁরা সংগ্রহ করে নিলেন নতুন গতিবেগ। নতুন জিজ্ঞাসার তাড়নায় তাঁরা সৃষ্টি করলেন নতুন নতুন মাধ্যম। এভাবেই সাগরদাঁড়ির ছেলে এখানে এসে নতুন অভিজ্ঞতার টানে অনুভব করেন মহাকাব্যিক কবিতার রূপরীতি। মেদিনীপুরের পথিক ছেলেটি পথচলার বেগে আবেগে সৃষ্টি করে সাহিত্যিক গদ্য। কাঁঠালপাড়ার কৃতবিদ্য যুবক নিজ জীবন-জিজ্ঞাসার আকর্ষণে সৃষ্টি করে ওই শতাব্দের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পমাধ্যম উপন্যাস।

উপন্যাস—এই নামকরণটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি ভাবার মতো। কোনো এক

সময় 'উপন্যাস' বলতে বোঝাত অলীক মুখরোচক গল্প। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কলকাতার বারোয়ারি পূজার বর্ণনায় জমিদার-ছেলে-দরোয়ানের গল্পটি শেষ করে হুতোম মন্তব্য করেছেন—'পাঠক বড় মানুষেরা এই উপন্যাসটি মনে রাখবেন'। অর্থাৎ ব্যাকরণ অভিধান-নিরপেক্ষভাবে কোনো এক সময় 'গালগল্প' অর্থে, বানানো গল্পের উদ্দেশ্যে উপন্যাস শব্দটি ব্যবহৃত হত। হয়তো পরে fiction শব্দের অর্থসাদৃশ্যে 'উপন্যাস' শব্দটি আকর্ষিত হয়ে থাকবে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'উপন্যাস' শব্দটি নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা করেছেন। উপন্যাস কথাটির 'উপ' উপসর্গটি লক্ষণীয়। রূপকথা' শব্দের 'রূপ' কথাটি যদি হয় সৌন্দর্যবাচক, 'উপন্যাস' কথাটির 'ন্যাস' শব্দটি তেমনি শৈলী নির্দেশক। জীবনের যথালব্ধ রূপ নয়, সেই রূপ স্বরূপের যথাযোগ্য বিন্যাস উপন্যাসে আসল কথা। 'উপন্যাস' শব্দটিতে 'উপকথা' শব্দের ছায়া যদি থাকেই তা হলেও তার কালোচিত গঠন-প্রকৃতিতে বিন্যাসের গূঢ় অর্থ প্রাধান্য পায়। এই প্রাধান্যের মূলে আছে পট এবং পটবিধৃত ব্যক্তিপাত্রের সম্পর্ক সংঘাতের বিষয়ে গূঢ় জ্ঞান। আপাত এবং নিহিতের মধ্যে সেতু নির্মাণ। সম্ভব এবং সম্ভাব্যের মধ্যে সম্পর্ক রচনা। 'ন্যাস' শব্দটির অর্থ 'রাখা' বা 'স্থাপন করা'। বিদ্যানিধি মহাশয় জানিয়েছেন, 'অঙ্ক কষিবার সময় রাশিগুলি যথাস্থানে ন্যাস করিতে হয়, বাংলায় বলি 'পাতন'। বিদ্যানিধি মহাশয়ের নির্দেশিত 'উপন্যাস' শব্দের আর-একটি অর্থ হল 'সমীপে স্থাপন'। যদি এই শেষতম অর্থটিকে আমরা গ্রহণ করি তা হলে কিন্তু উপন্যাসের আধুনিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয় না। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতাকে, অভিজ্ঞতার গূঢ়ার্থকে পাঠকমণ্ডলীর সামনে তথা সামাজিকের সমীপে স্থাপন করছেন। Narrative prose fiction কথাটির সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ উপন্যাস। সেই প্রাচীন আচার্য অর্ধ শতাব্দী আগে একটা কথা বলেছিলেন—"গল্পের 'বন্ধ' ঋজু, উপন্যাসের সঙ্কুল"। 'বন্ধ' বলতে তিনি plan-কে বোঝাচ্ছেন। 'সঙ্কুল' শব্দে তিনি বলতে চেয়েছেন complicated plot-এর কথা। অভিজ্ঞতার উপাদান গ্রন্থীভূত হলেই উপন্যাস হয় না। সেই প্রাচীন আচার্য আমাদের সকলের উপন্যাস বীক্ষণের বহু পূর্বে বলেছিলেন—'বস্তু ও বন্ধ অবশ্য চাই, কিন্তু তাজমহল পাথরের পাঁজা নয়, নির্মাণের গুণে অপূর্ব আনন্দ উদ্রেক করে। সে গুণের নাম কলা (art)।'

আবহমান কালের ভারতবর্ষ অনেক কথা বলতে চেয়েছে ও পেরেছে গল্প শোনাতে শোনাতে। গল্প শোনাতে শোনাতে গল্পের বাঁধুনি ভারতবর্ষ

আয়ত্ত করেছে সময়ের পথে পথে চলে। এই বাঁধুনিটাই কলা বা art। সংস্কৃত গদ্যে বলা গল্পে ন্যূনতম প্রয়াসে ব্যাপকতর বক্তব্য উপস্থাপনা করা হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত গদ্যে প্রাচীন ভারত একটি বিশিষ্ট ধারা সৃষ্টি করেছে। জাতকে পঞ্চতন্ত্রে বৃহৎকথায় জীবনের বৈচিত্র্য, কৌতুক সবই ফুটে উঠেছে—কিন্তু কখনোই বক্তব্য ব্যতিরিক্ত নয়। গদ্যের এই ধারবহতা ভারবহতা সারবহতা বাংলা সাহিত্যের হাতে ছিল না উনবিংশ শতাব্দীর আগে। গত শতাব্দীতে গদ্যময় বাস্তবতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গদ্যময় বাস্তবের ঘাতে প্রতিঘাতে সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রথম নাগরিক প্রয়াসের প্রধান সহযোগী রূপে দেখা দিল বাংলা গদ্য। পাঠ্যবই হিসাবে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করতে করতে সেই গদ্য অচিরে হল আমাদের তখনকার জীবননাট্যের প্রধান সংলাপ-মাধ্যম। রামমোহনে যা ছিল প্রাচীন বিতর্কধারার পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের বাদ-প্রতিবাদের স্মৃতিবহ, বিদ্যাসাগরে তা পরিণত হল প্রত্যক্ষ ভাষণে। অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার যা-কিছু সঞ্চয় তা সংহত হতে শুরু করেছে গদ্য মাধ্যমে। বিদ্যাসাগরের পুরাপর্যটনে, প্রতিবাদী বিদ্রূপে, অক্ষয়-ভূদেবের ভাবনা ভূয়িষ্ঠতায় এবং হুতোমি-আলালি ভঙ্গিতে বস্তুগত অনুপুঙ্খ বর্ণনায় এই গদ্যমাধ্যম নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করেছে। দিনে দিনে আসর প্রস্তুত হয়েছে। গদ্য যে ওই শতাব্দীর একটা মুখ্য অর্জন, এ বোধ দৃঢ় হয়েছে। ততদিনে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সমাজের শ্রেণীগত নৈতিক জগৎ অনেকটা দৃঢ়। এবং সবথেকে বড়ো কথা বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ান রূপে খ্যাত এই শ্রেণী নিজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যগ্র। তার অজস্র সহস্রবিধ অচরিতার্থতার মাঝেই সে উৎকণ্ঠিত, সংশয়াকুল চিত্তে নানা কর্মধারার স্বপ্ন দেখেছে। উপন্যাস তখনও উন-উপন্যাস। আমি সেগুলিকেই উন-উপন্যাস বলছি যেগুলি উপন্যাস হব-হব করেছে—অথচ সঠিক উপন্যাস নয়। 'ফুলমণি ও করুণা', 'সুশীলার উপাখ্যান' এমনকী 'মেজ বৌ' এরা সকলেই আমার কথিত উন-উপন্যাস—পুরো উপন্যাস নয়। অবশ্যই 'আলালের ঘরের দুলাল' এই সমস্ত প্রায়-উপন্যাস-গুলির মধ্যে সবথেকে বেশি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। যদিও এই তিনটি উন-উপন্যাসের প্রাথমিক লক্ষণ লোকহিতৈষণা, যদিও তারা পৃথক পৃথকভাবে সে যুগের নারী-পুরুষের কাছে জীবনের মানোন্নয়নের পথ নির্দেশ করে দিতে চেয়েছে, তথাপি এদের সকলের মধ্যে একমাত্র আলালের ঘরের দুলালেরই ছিল সেই অখণ্ড সমাজদৃষ্টি।

তিন

১৮৫৭-তে ঘটেছে সিপাহি বিদ্রোহ। এই ঘটনা বাঙালি মনীষাকে করে তুলেছে ইতিহাস সচেতন। এই প্রথম সমসাময়িক ইতিহাসের একটা বড়ো মাপের ঘটনা তাপে এবং আঁচে শিক্ষিত বাঙালির কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে। সে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার রূপ যাই হোক না কেন, পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় কল্পনা চঞ্চল হয়ে উঠেছে—জেগেছে বীরত্বপূর্ণ অতীত সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ কৌতূহল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অথবা হরপ্রসাদের উপন্যাসে ইতিহাসের দূরাগত ঘটনাঘন কালকল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তা যে শুধু আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করেছে তাই নয়, আমাদের অভিজ্ঞানসজাগও করে তুলেছে বটে। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের স্বদেশচেতনা দ্রুত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিস্ফোরক হতে চলেছে। ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতে, অন্তত রোমান্স রাজ্যেও আমরা এক স্বাধীন পুরুষকারের স্বপ্ন দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে চেয়েছি। কিন্তু সে পুরুষকারের স্বপ্ন যে খণ্ডিত! কলোনির ভদ্রলোকের দিবাস্বপ্নেও পড়ে শৃঙ্খলিত পঙ্গুতার ছায়া। বঙ্কিম রমেশ হরপ্রসাদের ইতিহাস-ঘেঁষা উপন্যাসগুলির পুরুষচরিত্রে তাই কমবেশি আড়ষ্টতা। স্বপ্ন—যাই হোক না কেন কিছুটা তো তা অপূর্ণ পুরুষকারের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বাঁকা ছায়া। এখানেই ছিল প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব যে তিনি বিষয় সংগ্রহ করলেন ইতিহাসের দূর প্রদোষান্ধকার থেকে নয়—সমসাময়িক বাস্তবতা থেকে। বাঙালির সেদিনের প্রত্যক্ষ ঘরের কথাকে তিনি ঘরের ভাষায়, ঘরোয়া ভঙ্গিতে বললেন। আর, সবটাকে তিনি স্থাপিত করলেন নিখুঁত পটজ্ঞানে, নির্ভুলভাবে। শহর মফস্‌সলের সেদিনের দৃষ্টি, সঠিক উপন্যাসের একটা প্রাথমিক শর্ত। বিষয়টি অবশ্যই পৃথকভাবে অনুধাবনীয়। খুব সম্প্রতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে—'প্যারীচাঁদ মিত্র: সমাজচিন্তা ও সাহিত্য'-তে দেখিয়েছেন সমাজবীক্ষণের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের লক্ষ্যভেদী ক্ষমতার তাৎপর্য কোথায়। তিনি ঠিকই বলেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগবাহিত মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখের রচনায় রঙ্গব্যঙ্গপ্রবণ দেশজ মনোভাবের যে পরিচয় মেলে প্যারীচাঁদের সঙ্গে তার সুগভীর পরিচয় ছিল। শ্রীদাশগুপ্ত বলেন—'প্যারীচাঁদ সমাজবীক্ষণের আধুনিক সচেতনতায়ই টেকচাঁদ ঠাকুরের বিদূষক সমাজ-পর্যবেক্ষকের ভূমিকা গ্রহণে এবং আলালের ঘরের দুলালে তার বিন্যাসে সেই রঙ্গব্যঙ্গের দেশজ ঐতিহ্যকে রূপান্তরিত করেছেন উপন্যাসের নতুন

সম্ভাবনাময় অবয়বে।' যে ঐতিহ্যের কথা শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, সেই দেশজ ঐতিহ্যের মধ্যে উপন্যাসের পূর্ব সূচনা খুঁজতে চাওয়া প্রথম শুরু হয়েছিল শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানী আলোচনার মাধ্যমে। সম্প্রতি শ্রীদেবেশ রায় আমাদের মধ্যযুগীয় পদ্যসাহিত্যের বিষয়নিষ্ঠ বাস্তবতার যে ধারা একদা প্রবহমান ছিল তার উৎসমুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একথাও ঠিক যে দেবেশ রায় তাঁর পর্যালোচনায় খুব মনোযোগ সহকারে দেখিয়েছেন স্বর ও বক্তব্যের অন্বয়ে সে সব রচনা কেমন ভবিষ্যতের ইঙ্গিতপ্রদ ছিল। কিন্তু এত কথায় পরেও বলতে কী পারি না যে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' মানে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র, তার 'বেশিকিছু নয়। চলতি জীবনছবির মধ্যে কালান্তরের যে স্বাক্ষর ছিল প্যারীচাঁদ তা ধরে দিয়েছিলেন শক্ত হাতে। কিন্তু একটা জায়গায় প্যারীচাঁদের সীমাবদ্ধতা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। তা হল চরিত্র নির্মাণে। আলালের ঘরের দুলালের রচয়িতা টাইপ-পর্যবেক্ষণে যতটা পারদর্শী ছিলেন, ব্যক্তিচরিত্রের উচ্চাবচতা কল্পনায় ততটা মনোযোগী ছিলেন না। একমাত্র ঠকচাচা চরিত্রটির মধ্যে ছিল উপন্যাসোচিত চারিত্রিক মাত্রার স্পর্শগম্য রূপরেখা। তা নইলে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি সাদা কালো এই দুই ছকে বাঁধা। এই সীমাবদ্ধতায় সার্থক মাপের উপন্যাস রচিত হয় না। কিন্তু প্যারীচাঁদই প্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আদল তৈরি করে দিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আজ আমাদের নেই। সব থেকে বিস্ময়কর ছিল তাঁর অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। সে ক্ষমতা আজও ঔপন্যাসিকদের ঈর্ষার বিষয়। বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র শিল্পীরও তারিফের বিষয়।

অন্তত দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র এই সজীব অনুপুঙ্খ সচেতনতার কোনো পরিচয় দিতে পারেন নি। ঐতিহাসিক আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রয়োগও এই গদ্য-কাহিনীতে সম্ভব হয়নি। চরিত্রগুলি পুতুল পুতুল। কিন্তু ফস্টর যাকে বলেছিলেন উপন্যাসের দুটি প্রাথমিক উপাদান—গল্প এবং ঘটনাসংস্থান—তা ছিল প্রায় অব্যর্থ। এর গদ্য ভঙ্গিমায় ছিল এমন একটা গুণ যে রচনাটি পড়ে শুনিয়ে শ্রোতা-দের মুগ্ধ করে ফেলা যেত। দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠের প্রথম সন্ধ্যাটির কথা—ভাটপাড়া নিবাসী দুজন পণ্ডিতের অভিভূত দুই মন্তব্য আজও আমাদের মনে আছে। একটা পার্শ্ববর্তী প্রসঙ্গ এখানে একটু আলোচনা করে নিতে চাই। হিরোয়িক টেল এবং বীররসভূয়িষ্ঠ কাব্যকাহিনী সম্মুখস্থ শ্রোতৃসমাজে—তা সে প্রত্যক্ষই হোক বা অনুমেয়ই হোক, চেঁচিয়ে পড়ার সামগ্রী। এই বীররসাত্মক কাব্যকাহিনীর যুগে বঙ্কিমি উপন্যাসের আবির্ভাব। কতকটা এ কারণেই তাঁর

উপন্যাসও বর্ণনা-সংলাপ সমেত ঠিকভাবে ঠিক ঝোঁক দিয়ে পড়লে তার উপভোগ্যতা বাড়ে। মোহিতলাল মজুমদারের বঙ্কিম উপন্যাস পাঠ যাঁদের স্মৃতিতে অম্লান আছে, তাঁরা আমার কথায় সায় দেবেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকে যায়। অন্তত আমাদের সে প্রশ্নের মোকাবেলা করতেই হয়। পদ্যমাধ্যম আর গদ্যমাধ্যম —এইটুকুই কি 'পদ্মিনীকাব্য' এবং 'শূরসুন্দরী'র সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র তফাত? এর উত্তরের মধ্যে আছে দুর্গেশনন্দিনীর স্বতন্ত্র শিল্প প্রকরণ হিসাবে অনিবার্যতার হদিস। এই উপন্যাসে আয়েষা নতুন কালের চরিত্র। উপন্যাস-সম্ভব চরিত্র। সে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' বলেছে বলে একথা বলছি না। সে বিষঅঙ্গুরীয় জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল বলে একথা বলছি। 'মরিব কেন' এই জিজীবিষা বঙ্কিম-নায়িকার মুখে অন্যূন তিনবার শুনেছি। আয়েষা প্রথম সে তালিকায়। সত্তার নিগূঢ় জটিলতা—যা উপন্যাসেই মাত্র রূপায়ণসম্ভব আয়েষা সেই নিয়তির দুর্বোধ্য স্বাক্ষরকে আপন জীবনে মুদ্রিত করে নিল। তাই এই চরিত্রের জন্য পদ্যমাধ্যম অচল। জীবনের নিহিত কাব্যকে, নিহিত নাটককে অভিব্যক্তির স্তরে নিয়ে আসার জন্য যে গদ্য কখনও কখনও অধিকতর মোক্ষম মাধ্যম হতে পারে এ কথা যিনি বলেছিলেন, যিনি ভেবেছিলেন গদ্যই তাঁর শতাব্দীর সর্বাধিক বহু উদ্দেশ্য-সাধক মাধ্যম, তিনি কপালকুণ্ডলায় লুৎফ এবং মেহের চরিত্রে এক অভিনব পরীক্ষা করলেন। প্রকৃতির সঙ্গে ইতিহাসের, অরণ্যমর্মর এবং সমুদ্রকল্লোলের সঙ্গে সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং কুটিলতার বিপরীত সমাবেশ এই গদ্যমাধ্যমেই সার্থকতা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এবং তা কপালকুণ্ডলায়—একটি প্রবহমান গদ্যরীতিকে সম্ভব করে তুললেন। ভাষণে, সম্ভাষণে, কথকী চালে, বিশ্লেষণে এবং বর্ণনায় এই গদ্য এর নায়িকার মতো রহস্যঘন, প্রতিনায়িকার মতো ছুটন্ত এবং নায়কের মতো বেপথু।

বঙ্কিমচন্দ্রের কালগত পটভূমিটির প্রাথমিক পরিচয়টি একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। এ হচ্ছে সেই সময় যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত, বিশেষত ইংলিশ এডুকেশনাল মিড্‌লক্লাসের গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, তার মনোভূমির শক্তি এবং বৈকল্য দুই ধরা পড়তে শুরু করেছে। ১৮৪১-এ বেঙ্গল হরকরায় একজন ডিরোজিয়ান সারদাপ্রসাদ ঘোষ লিখেছিলেন—আমাদের অবনতি এবং দুরবস্থার মূল কারণ আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাব। ১৮৪৩-এই প্রিন্সিপ্যাল রিচার্ডসনের নির্দেশে 'ট্রিজ্‌ন'-এ প্রশ্রয় দিচ্ছে এই অভিযোগে জ্ঞানান্বেষিণী সভার অধিবেশন হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজে বসার অনুমতি হারাল। এটাই সেই সময় যখন

উত্তর-ডিরোজিয়ানরা রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীলদের সঙ্গে একত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে মিলিত হলেন। এই হচ্ছে সেই সময় যখন সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ তৃণমূলে ঘটে গেলেও তা কদাচিৎ স্বীকৃতি পেল মধ্যবিত্ত মানসে। উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্তের সকল স্ববিরোধ, সংকোচ, সংশয় এবং বেদনার মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল চরিত্রপাত্রের পুরুষার্থ-সংকট, একদা যে লেখক পূর্ণ মনুষ্যত্বের দুর্ব্যাখ্যেয় সংজ্ঞার্থ খুঁজতে গিয়ে গ্যেটেকে আদর্শ বলে ধরেছিলেন, সে লেখক যে ভারতীয় ঔপনিবেশিক খণ্ডিত জীবন-চর্চায় ব্যক্তির নানা উদ্‌ভ্রান্ততা সত্ত্বেও তার ট্র্যাজিক মহিমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন এটা স্বাভাবিক। দেশকালের প্রতিঘাতে ও তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার জন্য সে চেষ্টা এমন কী মেঘনাদ বধের রাবণের ডাইমেনশনও পেল না। এই প্রয়াস ও ব্যর্থতার স্বরূপ বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য, এই প্রয়াসের মূল প্রেরণায় বাঙালি মধ্যবিত্তের সদ্যোজাত আত্মসম্বিতের টান। এই ব্যর্থতার শিকড় রয়েছে সেই মধ্যবিত্তেরই পায়ের নিচের ফাটলধরা মৃত্তিকার অসংলগ্নতায়। এই প্রসঙ্গে প্রথম আলোচ্য তাঁর ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলি—সেখানে বর্তমান লেখক মনে করেন তাঁর উৎকণ্ঠার সমধিক শিল্পময় প্রকাশ। দ্বিতীয় আলোচ্য তাঁর পারিবারিক উপন্যাসগুলি—যেখানে তাঁর পশ্চাদপসরণ সব থেকে প্রকট। তৃতীয় আলোচ্য তাঁর সমুদয় উপন্যাসের নারী চরিত্র—যা তাঁর সবল ও দুর্বল উপন্যাস-গুলিকে সমানভাবে মেরুদণ্ডী রেখেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলি নূতনতর নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আমরা এখন বুঝতে পারছি ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলিই ছিল তাঁর 'Forte', তিনি 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ' ইংরেজিতে লিখে যাত্রারম্ভ করেছেন বটে, কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। যাত্রা শেষও করেছেন ত্রয়ী উপন্যাসে—সে তিনটি উপন্যাসও ইতিহাসদীপিত। উপন্যাস লেখা থামিয়ে দেবার বহু পরে সৃষ্টিকর্মে আরেকবার মাত্র তিনি হাত দিয়েছেন—'রাজসিংহ' উপন্যাসের সংস্কারের নামে পুনঃসৃষ্টি। তাঁর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস তাঁর সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবনের মাঝখানের একটি অধ্যায়। সম-সাময়িক সমাজ বা পারিবারিক জীবন আকর্ষণ করেছে তাঁর চিন্তাকে, জীবন-ভাবনাকে—কিন্তু তাঁর কল্পনার মুক্তি ঘটেছে তাঁর ইতিহাসদীপিত উপন্যাসে। 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ' উপন্যাসে ব্যবহৃত সামাজিক বাস্তব উপাদানে বৃহত্তর

কল্পনার অবকাশ নেই। সেটা 'দুর্গেশনন্দিনী'-র প্রশস্ত প্রান্তরে আছে। 'কপাল-কুণ্ডলা'র অভিনব পরিকল্পনায় সে স্বাধীনতাভোগ সহজ। অর্থাৎ বাস্তবের দৈন্য থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাড়িত হয়েছেন ঐতিহাসিক রোমান্সের রঙিন রাজপথে—এরূপ অনুমান মূলত নির্ভুল, যদিও ব্যাপারটার পিছনে একটা প্যারাডক্স্ আছে।

ইতিহাস তখন বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে সবে সত্য হয়ে উঠেছে। আঠারোশ সাতান্নর ঘটনা আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে প্রথম প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। সতীদাহ-রোধ, বিধবা-বিবাহ এগুলি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সমাজে—সে সমাজও বাঙালির কাছে নতুন। সমাজও নতুন, ইতিহাসও নতুন—তবু এ দুয়ের মধ্যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে ইতিহাস। তার কারণ ব্যক্তি—বঙ্কিমের কল্পনার ব্যক্তি—সামাজিক মানুষ হয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পারত না। ইতিহাসদীপিত প্রান্তরে বঙ্কিমের কল্পনার ব্যক্তি নিজের নিগূঢ় নিয়তির মুখোমুখি হতে পারত খোলাখুলি। উনবিংশ শতকীয় বঙ্কিমীসমাজের নানা প্রশ্ন তাকে আড়ষ্ট করে ফেলার সুযোগ সেখানে পেত না। উনবিংশ শতকীয় পজিটিভিস্ট ও ডিটারমিনিস্টিক বিশ্ববীক্ষার কারণে ব্যক্তি ও সমাজের যে দ্বৈতসত্তা মাথাচাড়া দিয়েছিল বঙ্কিম সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন—তাঁর মোটা সংখ্যার প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর সামাজিক উপন্যাসে সে অবধানতা কার্যকর করতে পারেন নি। তাঁর সমুদয় ভদ্রলোক নায়ক চরিত্র এ কথার প্রমাণ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক জগৎ সিংহ ইতিহাসের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও একটি নতুন প্রকৃতির সূচক হয়ে উঠেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জগৎ সিংহ এবং আয়েষার প্রেমের ঘটনার ভিতরই আমরা বঙ্কিমের মানসিক স্বাধীনতার প্রথম রূপটি দেখতে পেলাম। কারাগারে জগৎ সিংহ এবং আয়েষার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি মোটেই ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে আয়েষার দিক থেকে প্রেমানুভূতির অনিবার্য বিস্ফোরণে তা হয়ে উঠেছে অনেকখানি আধুনিক। এই উপন্যাসের দুটি চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়—বীরেন্দ্র সিংহ ও আয়েষা। বীরেন্দ্র সিংহ ফিউডাল আত্মাভিমানের একটি মনুমেণ্টীয় প্রতীক। তার পতনও ঘটেছে মনুমেণ্টীয় মহিমায়। কিন্তু আয়েষা ফিউডাল কাঠামোর মধ্যে থেকেও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শুধু যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করেছে তাই নয়, জীবনমৃত্যুর সংকট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আয়েষা ধীশক্তির সাহায্যে জীবনের প্রতি পক্ষপাত জানিয়ে তার আধুনিকতাকে স্পষ্ট করেছে। আয়েষা যে যুগের মেয়ে সে যুগে এমন ধরনের

আধুনিক ধীশক্তি সম্ভব ছিল কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যে necessary anachronism বা আবশ্যিক কালানৌচিত্য এ জাতীয় মহাকাব্য বা উপন্যাসের প্রয়োজনীয় উপাদান, বঙ্কিমচন্দ্র তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের লুৎফা-উন্নিসা এবং মেহের-উন্নিসা সাক্ষাৎকারের পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় আবশ্যিক কালানৌচিত্যের আরেকটি নিদর্শন। এই দুই নারী সম্পূর্ণরূপে Free will বা স্বাধীন ইচ্ছার ধারক। যদিও লুৎফা-উন্নিসা একথা বলেছে যে, দিল্লির জাহাঙ্গীর বাদশাহ, আমির ওমরাহো থাকতে সপ্তগ্রামবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমারের জন্য আকুল হওয়া তার ললাট লিখন—তথাপি সে ললাট লিখনের চেয়েও তার মধ্যে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপান্বিত করে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা। লুৎফা-উন্নিসা এবং মেহের উন্নিসা দুজনেই বুদ্ধি এবং মননের সাহায্যে নিজ নিজ আবেগগত অমীমাংসার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। এই ধরনের চরিত্রকল্পনা উনবিংশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ফ্রেমে সম্ভব ছিল না। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীর সক্রিয় ভূমিকা রূপায়ণের জন্য ইতিহাস থেকে কালখণ্ড বেছে নিতে হয়েছে। লবঙ্গলতার পক্ষে লুৎফা-উন্নিসার মতো ব্যবহার সম্ভব ছিল না, ইন্দিরার পক্ষেও নয়। তার কারণ ওইসব নারীচরিত্রগুলি তাদের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের দ্বারা প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। যারা পেয়েছিল, রোহিণী ও কুন্দনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের দুজনকেই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিক ভবিতব্যের বলি রূপে নির্দিষ্ট করে দিলেন। সামাজিক ভবিতব্য ব্যাপারটি সেখানে মুখ্য হতে পারল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলির মধ্যে এই প্রসঙ্গে আর একটি চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে হল মবারক। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে মবারক সে গুরুত্ব পায়নি—সে গুরুত্ব চরিত্রটি পেয়েছে উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণে। মবারক চরিত্রটির মধ্যে যে death wish প্রবল, তা চতুর্থ সংস্করণের ফল। এই death wish মবারককে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। তার দরিয়া ত্যাগ, জেবউন্নিসার সঙ্গে প্রেম, প্রেমের বিষময় পরিণাম, অথচ বিষকে অমৃতজ্ঞান—এ সবই বঙ্কিমীজগতের সামগ্রী। কিন্তু যে আবশ্যিক কালানৌচিত্য (necessary anachronism) চরিত্রটিকে আধুনিক দীপ্তি দিয়েছে তা হল চরিত্রটির death wish, এবং এর মূলে মবারক-জেবউন্নিসার প্রেম। সে প্রেম যেমন হোক, সে প্রেমের পরিণতি যে বিবাহ, তা এই দুই নরনারীর সমুদায় ব্যাপারটিকে মধ্যযুগীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক করে তোলে।

একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—পিতার অভিভাবকত্ব অস্বীকার করে কন্যা বিবাহের সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং তা কার্যকর করল, বঙ্কিমি উপন্যাসে এ ঘটনা এই প্রথম। মবারকের দিক থেকেও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনীয়। সে বাদশাহের অধীনস্থ কর্মচারী। কিন্তু তার স্বাধীন বিবাহ তার জীবনে মানসিক বিড়ম্বনাবোধকে তীব্র করে তুলল। এই বিবাহের উদ্যোগপর্বে সে উপলব্ধি করেছে যে তার সঠিক কর্মময় ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন। পুরুষ তার কর্মিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সচেতনতায় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন—এটা একটা আধুনিক দায়িত্ববোধ। বঙ্কিম নিজে সচেতনভাবে যে শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এটা সেই শ্রেণীর দায়িত্ববোধ। সুতরাং মবারক যখন দেখল তার প্রেম-মীমাংসা তার জীবন-মীমাংসায় রূপান্তরিত হল না, তখনই তার বিবাহ বহন করে এনেছে বিষাদ। এবং এই বিষাদ 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথের বিষাদের বিপরীত। অমরনাথের ঊনবিংশ শতকীয় অধ্যয়নলব্ধ আধুনিকতার ফলে তার বিষাদ এক প্রকার বিষাদ-দর্শন। অমরনাথ তার এই বিষাদের সঠিক কারণ নির্দেশে সক্ষম হয় নি। তবুও আমরা বুঝতে পারি যে, লবঙ্গলতার ঘটনার আঘাতেই তার নৈরাশ্য ক্রমশ পরিণত হয়েছে ঔদাসীন্যে ও সংসার বৈরাগ্যে। শেষ পর্যন্ত অমরনাথ সংসার ত্যাগ করেছে। কিন্তু সে সংসার ত্যাগ গোবিন্দলালের সন্ন্যাস গ্রহণের মতো ঈশ্বর বিশ্বাসের ফল নয়। মবারকের বিষাদ কোনো নৈরাশ্য থেকে আসে নি, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা-জনিত নিগূঢ় অকৃতার্থতা বা অচরিতার্থতা থেকেও তার সেই বিষাদবোধ আসেনি। জেবউন্নিসাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্তে সাধারণ বিচারে তার ব্যক্তিগত জয়ই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তার সেই ব্যক্তিগত রাগরক্তিম স্বপ্নের সফল পরিণতির মুহূর্তেই তা বিষাদঘন হয়ে উঠেছে! সে একথা ভুলতে পারেনি যে, সে মনসব্‌দার। মুঘল রাজপুতের যুদ্ধে তার যথার্থ ভূমিকা ছিল রণাঙ্গনে। সে সেই ভূমিকা পালন করতে পারে নি। বিরহের বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষা কর্মী-পুরুষের এই অচরিতার্থতার যন্ত্রণা কম তীব্র নয়। এইজন্য সে বারবার রাজপুত পক্ষকে এ প্রার্থনা জানিয়েছে যে, তাকে তোপের মুখে রেখে উড়িয়ে দেওয়া হোক। এই মৃত্যুবাসনাই মবারকের অবচেতনের কালো ছায়া দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। সে কালো ছায়া দরিয়া। তার ব্যক্তিগত জীবনের পানপাত্রটি যখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই তার কর্মী জীবনের অকৃতার্থতা এবং দরিয়া সংক্রান্ত পাপবোধ একত্রে সেই পানপাত্রের পূর্ণতাটি খণ্ডিত করেছে। সেখানে যে ছায়াটি ভেসে উঠেছে তা মৃত্যুরূপিণী দরিয়ার ছায়া।

এর পূর্বে লিখিত 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপও এক মৃত্যু-ইচ্ছার দ্বারা অধিকৃত ছিল। তা শুধু রোমান্টিক মৃত্যুবাসনা নয়। এই সমাজ আমাকে বা আমাদের বাঁচতে দেয় না—এই জাতীয় একটা বোধ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রতাপের মৃত্যু ইচ্ছার মধ্যে কাজ করেছে। রমানন্দস্বামীর প্রতি তার শেষ দৃপ্ত ভাষণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সে দৃপ্ত ভাষণের মূলকথা—সব প্রকার সামাজিকনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার। 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী'—এই বাক্যে 'কমা' চিহ্নটি লক্ষণীয়। কমা চিহ্নটি এভাবে থাকার ফলে 'সন্ন্যাসী' আর সম্বোধনবাচক শব্দ নয়। শব্দটি ব্যঙ্গাত্মক অভিধায় রূপান্তরিত হয়েছে। মবারকের মৃত্যু-ইচ্ছা ও প্রতাপের মৃত্যু-ইচ্ছার মধ্যে মিল অমিলটাও এই সূত্রে অনুধাবনযোগ্য। মবারক ও প্রতাপের মৃত্যু-ইচ্ছার উৎস রয়েছে তাদের প্রেমে। প্রেম তাদের জীবনে যে গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন নিয়ে এল সেটাই দেখা দিল তাদের নিয়তিরূপে। মিল এইটুকু। অমিলটাই বেশি। প্রতাপের নৈতিক সচেতনতা এক মাত্রার ব্যাপার, মবারকের ভূমিকাসচেনতা আর এক মাত্রার ব্যাপার। মবারক জেনেছিল জীবন বড় সুন্দর—কিন্তু জীবনের খাতায় যে অঙ্কগুলি সে বসিয়েছে তাদের যোগফল যে এড়াতে পারে না—মরতে তাকে হবেই (ইয়া আল্লা, আমাকে মরিতেই হইবে)। প্রতাপ জেনেছিল এখানে বাঁচার কোনো মানে হয় না। বেঁচে থেকে সে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না, উপরন্তু সকলের জটিলতাই আরো বাড়িয়ে তুলবে। প্রতাপ যে প্রেমবোধ তাড়িত তা বঙ্কিমের অন্য নায়কের মধ্যে নেই। প্রেমমোহ আর রূপতৃষ্ণা একই প্রবৃত্তির দুই পিঠ—একথা প্রতাপের প্রেম সম্বন্ধে খাটে না। সৌন্দর্যবোধ থেকে জন্মায় প্রেম, প্রেম থেকে জন্মায় প্রেমের পাত্রের জন্য আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। একথা বঙ্কিমের সকল প্রেমেরই গূঢ়কথা—এমন কি দেশপ্রেমেরও। তাই প্রতাপ মৃত্যু শিয়রে রেখে রমানন্দস্বামীকে বলে গিয়েছিল—'আমার ভালবাসার নাম জীবন-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।' প্রতাপের মধ্যে স্পন্দিত রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি। অথচ তা অমূলতরু নয়। মীরকাসেমের পক্ষে সে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তার কারণ প্রতাপের ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব উপলব্ধিতে নিহিত।

লক্ষণীয় বঙ্কিমের ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলিতে কখনও কখনও অতিশক্তি-শালী সাবপ্লট ব্যবহৃত হয়েছে। 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' (চতুর্থ সংস্করণ) উপন্যাসের সাবপ্লট এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এক হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা'র অতি ক্ষুদ্র মেহের-কাহিনী এবং 'মৃণালিনী'র মনোরমা-পশুপতি কাহিনীর বিষয়টিও

এখানে ভাবা চলে। কাঠামো বিচারে এসব সাবপ্লটের গুরুত্বনির্ণয় সমালোচকেরা আগে করেছেন। 'মৃণালিনী'র মনোরমা চরিত্র সম্বন্ধে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাতী মন্তব্য আমাদের স্মরণে আছে। কিন্তু এই সাবপ্লটগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সাবপ্লটগুলির প্রধান চরিত্রপাত্র অনেক ক্ষেত্রে তারাই যারা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতা স্বপ্নের প্রতিভূ। মনোরমা-মীরকাসেম-মবারক বা অন্যার্থে মেহের অনেকাংশে জীবনের বাঁধা ছকের বাইরের মানুষ। তাদের প্যাটার্ন অফ থিঙ্কিং বা অ্যাটিট্যুড টুওয়ার্ডস লাইফ কেবল যে রোমান্টিক ব্যক্তি-অভীপ্সার দ্বারা চিহ্নিত তাই নয়—ঊনবিংশ শতকীয় র‍্যাশনলিজমও তারা তাদের স্রষ্টার কাছ থেকে ধার পেয়েছে। সাবপ্লটের এইসব চরিত্রপাত্রেরা মধ্যবিত্তের তখনকার নবার্জিত স্বাতন্ত্র্যবোধে—যার বিপরীতার্থক শব্দ পারতন্ত্র্য তদ্দ্বারা চিহ্নিত। সুতরাং হেগেল কথিত necessary anachronism এখানেও লক্ষিত। অথচ চরিত্রগুলি সে-যুগের historical peculiarity বা ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলে আধুনিক হয়ে যায় নি। তাহলেই তারা হত অনাবশ্যক কালানৌচিত্যের নিদর্শন—সুতরাং কুশিল্প। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মাত্র এক পরিচ্ছেদগত মেহের-উন্নিসা বিবাহিত জীবনের মধ্যবর্তী থেকেই তার স্বতন্ত্র প্রেমের জন্য দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারে নি। গোপন করে নি। মধ্যযুগীয় রোমান্সের পটভূমি থেকে বঙ্কিম এ জাতীয় চরিত্র কল্পনা করেছেন বটে, কিন্তু মেহের-উন্নিসার প্রখর বুদ্ধিমত্তা, মানবচরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি এবং সচেতন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ('সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?') নারীর আধুনিক ব্যক্তিত্বের পূর্বগামিনী ছায়া। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাসেম যখন বলেন, 'যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন?···আমি সেরাজউদ্দৌল্লা নহি—বা মীরজাফরও নহি', তখন আমরা রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝখানে দণ্ডায়মান এক স্বাধীনতামনস্ক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মীরকাসেমের পতন বাংলার ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের একটা শোচনীয় ব্যাপার বলে বঙ্কিমের কাছে পরিগণিত হয়েছে। তখনও শাসনকর্তার বিচারদণ্ড নবাব নিজের হাতে ধরে রাখতে প্রয়াসী। অথচ আশ্চর্য, উপন্যাসে মীরকাসেমের স্রষ্টা মীরকাসেমকে যথা-সম্ভব ধূম্রাচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছেন। বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে বিষয়টি আলোচনা করা যাবে।

কেউ কেউ লক্ষ করেছেন, বঙ্কিমের পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা তাঁর উপন্যাসের নারীরা অধিকতর সজীব ও গতিশীল। তাঁর ভদ্রলোক পুরুষ চরিত্রের আড়ষ্টতা

তো সুবিদিত। কমলাকান্তের মতো কোনো চরিত্রকে তিনি যদি উপন্যাসে নায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অনেকটা খণ্ডিত হয়ে যেত। বঙ্কিমের সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রমালায় কমলাকান্তই একমাত্র পুরো-মাপের আধুনিক মানুষ। তার চিন্তায়, আচরণে, সমাজ অননুমোদিত জীবন-যাপনে—সর্বোপরি অস্তিত্বের যন্ত্রণায়, আত্মসম্বিতের বেদনায় এমন চরিত্র বঙ্কিম উপন্যাসে ব্যবহার করতে পারলেন না এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উপন্যাস-তত্ত্ব লিখে যাননি। অংশত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও মুখ্যত ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' আলোচনাই তাঁর উপন্যাস বিষয়ে একমাত্র আলোচনা। তা থেকে এ কথা বোঝা মুশকিল যে তিনি উপন্যাস বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্বে আশ্রিত ছিলেন কী না। ওই আলোচনা থেকে শুধু একটা কথাই স্পষ্ট হয় যে তিনি উপন্যাসে বিষয়ীর স্বারাজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, বিষয়ের স্বাধিকার মানতে রাজি ছিলেন—বিশ্বাস করতেন গদ্য মাধ্যমের আধুনিক পারঙ্গমতায়। 'কল্পতরু' উপন্যাসটি আলোচনাকালে বঙ্কিম একটি জরুরি বিষয়ের অবতারণা করেন—তা হল মনুষ্য চরিত্রের দ্বিপ্রাকৃতিকতা। এই দ্বিপ্রাকৃতিকত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যতিরেকে উপন্যাস যে মহৎ সৃষ্টি হয় না সে বিষয়ে বঙ্কিমের অবধানতাও এই আলোচনায় স্পষ্ট। প্রকৃতিমূলক চিত্র—যাকে পরবর্তী উপন্যাস সমালোচনার ভাষায় naturalistic বলি তা মাত্র উৎকৃষ্ট হতে পারে—প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির সম্পূর্ণতা তাতে থাকবে না—এ জাতীয় একটি অভিমত বঙ্কিম পোষণ করতেন, এরূপ অনুমানের কারণ এ আলোচনায় আছে। 'সম্পূর্ণ কাব্য' বলতে বঙ্কিম এ আলোচনায় যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মূলে রয়েছে জীবনের সমগ্রতা সম্বন্ধে লেখকের চেতনা। তিনি অবশ্য 'সমগ্রতা' (totality) শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তিনি সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন 'মহদংশ' শব্দটি। দ্বিপ্রাকৃতিকতার বর্ণিল দীপ্তিতে বঙ্কিমের কমলাকান্ত চরিত্রের মধ্যে উক্ত মহদংশের শৈল্পিক রূপায়ণ যে সম্ভব ছিল তা বঙ্কিম নিজেও জানতেন।

কিন্তু তাহলে তাঁর নিজের উপন্যাসে কমলাকান্ত-প্রতিম নায়কের উপযুক্ত অব্‌জেক্‌টিভ কোরিলেটিভ রচনা করতে গেলে ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিক এলিটিজ্‌ম-এর ক্রোড়ে লালিত বঙ্কিমচন্দ্রের পজিটিভ সমাজের স্বপ্ন প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হত এবং সে সংঘাতে স্রষ্টাকেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হত, যেমন বারে বারে হয়েছে। এখানে আমরা আবার 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মীরকাসেমের কথা তুলব। 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এই তিনটি

উপন্যাসই বাংলার ইতিহাসের প্রায় একই কালখণ্ড নিয়ে লেখা উপন্যাস—তিনটি উপন্যাসেরই শেষ কথা পথের কাজ পথে ফেলে রেখে ভাঙাঘর গোছানোর ভূমিকায় নায়ক নায়িকার প্রত্যাবর্তন। মীরকাসেমের প্রথম পদার্পণে যে দৃপ্ততা তা অচিরে হারিয়ে গেল হেস্টিংস্‌কে সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে। মীরকাসেমের কামান নিনাদের প্রতিশ্রুতি তকি খাঁয়ের বুকে ছুরি ফুটিয়ে শেষ হয়ে যায়। ভবানী পাঠকের শিষ্যা ঘর ঝাঁট দিতে চলে যায়। এই বোধহয় সিপাহি যুদ্ধোত্তর বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানের স্টেবিলিটি সাধনার সতর্ক প্রচেষ্টা—নাকি এ শুধু তাই নয়, এ বুঝি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নেটিভ কর্মচারীর সার্ভিস বুক সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত উদ্বেগ।

এতৎসত্ত্বেও একটা কথা এই তিনটি উপন্যাস প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে কালখণ্ড এই তিনটি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে সেই কালখণ্ডের প্রধান লক্ষণ হল অরাজকতা এবং অস্থিরতার মাঝখানে স্থিরাবস্থার সন্ধান। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাঙালি লেখক যিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে। তাঁর ইতিহাসবোধ তাঁর স্বদেশচেতনায় ফল। এবং উলটোটাও কম সত্য নয়। অর্থাৎ, তাঁর স্বদেশচেতনা তাঁর ইতিহাস জিজ্ঞাসার ফল। কথিত তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের অন্তিমলগ্নে ইংরেজ একটা বহিরাগত শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সমস্ত ইতিহাসটাই মীরজাফরি ইতিহাস নয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অতি অপরিণত রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে কিন্তু সুপরিণত ক্রোধ নিয়ে সে বাঙালি নবাগত শক্তির সঙ্গে রণক্ষেত্রে মোকাবেলা করতে চেয়েছে। যদিও সেই রণক্ষেত্রেরই একটি সংকট ছিল, তা হল ইতিহাস বিরোধী পক্ষের অনুকূলে—তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনটি উপন্যাসেই যাদের বীরের মর্যাদা দিয়েছেন তারা হল সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক ও মীরকাসেম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখার বিষয় যে তাঁর উপন্যাসের প্রকৃত নায়কেরা কেউ এ জাতীয় বীরের মর্যাদা পায়নি। হয়তো এ ব্যাপারেও বঙ্কিমের নিজ যুগের ছায়া পড়েছে। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে এ জাতীয় বীরেরা আর মুখ্য ভূমিকার ছিল না—ছিল অদূরগত ইতিহাসের স্মৃতিমাত্র।

কিন্তু এ অভিযোগ থেকে কথঞ্চিৎ মুক্ত বঙ্কিমের নারীচরিত্রগুলি। বঙ্কিমের দুর্গাকল্পনাকে পরে অরবিন্দ 'ভবানী ভারতী' কল্পনা করেছেন। যে আর্কেটাইপ থেকে বঙ্কিমের এ কল্পনা স্ফূর্তি, তার প্রধান শক্তি গতিশক্তি বা ডাইনামিজ্‌ম্‌। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাগুলি লিখিত হতে থাকে ১৮৭৫ সাল নাগাদ। এই সময়েই "আমার দুর্গোৎসব" রচনায় তিনিই আর্কেটাইপের দ্বারা আবিষ্ট হন।

এই আর্কেটাইপ পরে তাঁর দেবী চৌধুরাণী কল্পনায়, শ্রী ও জয়ন্তী কল্পনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 'আনন্দমঠে'র কল্যাণী কল্পনাতেও এর ছায়া আছে বলে মনে করি। কিন্তু আমার এখানে বলার কথা এই যে, ওই আর্কেটাইপ ছায়া ফেলুক বা না ফেলুক—বঙ্কিমের সমস্ত নায়িকা-ব্যক্তিত্বে একটা ছক্কায়পঞ্জায় ছুটন্তভাব আছে। ব্যতিক্রম মাত্র দুজন—লবঙ্গলতা ও ভ্রমর। এর মধ্যে লবঙ্গলতা কল্পনায় ওই আর্কেটাইপ-এর পূর্বগামী ছায়া অস্পষ্ট হলেও দুর্লক্ষ্য নয়। লবঙ্গলতা চরিত্রটি অনুধাবনের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাসমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত দরকার। প্রথম লক্ষণ—একথা কেউ কেউ লক্ষ করেছেন, রাধারাণী ছাড়া বঙ্কিমের কোনো নায়িকার নাম হিন্দু দেবলোক থেকে সংগৃহীত নয়। কিয়দংশে মাত্র তা ভাববাচক (শান্তি, কল্যাণী)। প্রধানাংশে তা প্রকৃতি-বাচক। লতা, ফুল, ফলের আনুষঙ্গিক, নদী, নক্ষত্র—প্রকৃতির এই সব নানা প্রসঙ্গে তাঁর নামমালা গাঁথা। এই নাম নির্বাচনকে আমরা পুরোপুরি তাঁর স্বাধীন রোমান্টিক কল্পনার দান বলতে পারতাম, যদি না লক্ষ করতাম তাঁর দুই অসুখী নায়িকার নাম নদী ও নক্ষত্রের নামে—শৈবলিনী ও রোহিণী। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জ্যোতিষ মতে নদী ও নক্ষত্রের নামে মেয়েদের নাম রাখতে নেই। রাখলে তারা অসুখী হয়। কিন্তু এই সামান্য হেরফেরটুক বাদ দিয়ে তাঁর নারী-প্রকৃতিগুলির স্বাধীনতাবোধের কথা ভাবলে এ নাম-করণের সার্থকতা বোঝা যায়। বোঝা যায় তখনও তিনি দেবী নামের ব্যঞ্জনায় যে আদি প্রতিমার ভাবলোক ক্রিয়াশীল তা থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। হিন্দু দেবদেবীর নামে ছেলেমেয়েদের নাম রেখে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেব না—'ফুলমণি ও করুণা'র পরিশিষ্টে প্রচারিত এমন একটা নেতি-মূলক মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের অবশ্যই নয়। তাঁর নায়িকাদের জীবনতৃষা পূর্ণত তাদের স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত আবিষ্কারের ফল। এই আবিষ্কারের মূলে যে আধুনিক ইতিবাচক জীবনবোধ, তার প্রভাবে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর নায়িকাকুলের দ্বিতীয় লক্ষণ, সে দ্বিতীয় লক্ষণটি হল—সূর্যমুখী-ভ্রমর-লবঙ্গলতা ছাড়া তাঁর প্রধান নায়িকারা সকলেই কোনো না কোনো কারণে ঘরছাড়া। যে যুগের বাঙালি মেয়েরা ঘরের চার দেওয়ালের চতুঃসীমার বাইরে বড়ো একটা বেরুত না, সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এক ঝাঁক মেয়ের কথা ভেবেছেন পথেই যাদের পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে—পথকে যাঁরা ভয় করেনি। সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পথ বা আউটডোর পটভূমি একটা প্রধান ব্যাপার। কপালকুণ্ডলা, লুৎফা, মৃণালিনী,

গিরিবালা, শৈবলিনী, দলনী, প্রফুল্ল, শান্তি, কল্যাণী, শ্রী, জয়ন্তীর—এমন কী পারিবারিক উপন্যাসের ইন্দিরারও জীবনে প্রধান ঘটনা তাদের শিখিয়েছে পথকে ভয় না করতে। এই পথের প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নায়িকাদের সাহসিকতার দিকটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের সাহসিকতা গুণটি কাব্যে উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রশ্রয় পেয়েছে সব থেকে বেশি। মধুসূদনের হাতে এর প্রথম সূত্রপাত। বঙ্কিমের উপন্যাসে এর সম্যক বিস্তার। এটা যে একটা গুণ, সেটা মধ্যযুগীয় ভাববৃত্তে কোনোদিন স্বীকৃতি পায়নি বেহুলা এবং রাধা ছাড়া। বাঁধা কাঠামোর আনুগত্যই সেখানে ছিল নিয়তি, নতুনকালে সেখানে সাহসিকতা দেখা দিল স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গিনিরূপে। এই সাহসের ফলও হয়েছে কত বিচিত্র। রাধারাণী নিজের বিয়ের সম্বন্ধ, উদ্যোগ, পাত্রকে যাচাই করা সব নিজে করেছিল। লোকাচার বিরোধী এ আচরণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাধারাণীর এ আচরণের মূলে কেবল রোমান্টিক প্রেম তৃষাকেই প্রধান শক্তি বলে ভাবেন নি। রাধারাণীর এ জাতীয় আচরণের সংগতি প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি প্লটের সাহায্যে একটা সুদৃঢ় যৌক্তিকতা সৃষ্টি করেছেন। পরিণত রাধারাণী আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর। এই স্বনির্ভরতা ছাড়া রাধারাণী তার সাহসিক পদ-ক্ষেপের একটিও গ্রহণ করতে পারত না। পরোক্ষেও একথা সত্য। আর্থিক স্বনির্ভরতা ছাড়া প্রফুল্ল নিজের এমন কী সাগর বৌয়েও সকৌতুক সমস্যার সমাধান করতে পারত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারী ব্যক্তিত্বের এই প্রেক্ষাপটে লবঙ্গলতা একটি ব্যতিক্রম। 'রজনী'র লিখনকাল ১৮৭৪-৭৫। 'রজনী'র নতুন কাঠামো এবং তার নায়িকাকল্পনা দুই-ই একথা প্রমাণ করে যে, বঙ্কিম নিজেও যথেষ্ট সাহসী লেখক। গল্পকে তিনি প্রাচীন কাঠামো থেকে মুক্ত করতে চাইছেন, নায়িকাকে তিনি প্রথাবিমুক্ত করতে চাইছেন। ১৮৭৪-৭৫ বঙ্কিমের মনীষার পক্ষে উজ্জ্বলতম দীপ্তি বিকিরণের কাল। ১৮৭৪-৭৯-র মধ্যে তিনি সব থেকে বেশি ভাবনাচঞ্চল, সব থেকে বেশি অগ্রণী জিজ্ঞাসায় দৃপ্ত। 'চন্দ্রশেখর' অথবা 'রজনী' অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অন্যদিকে 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য'—শিখরে শিখরে বঙ্কিম তখন নতুন নতুন জয়পতাকা প্রোথিত করেছেন। এ সবের সূত্রপাত ঘটে 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'তে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ধ্রুপদী কাহিনী বিন্যাসের মাঝেও বঙ্কিমের গৌরব বিবাহিতা নারীর ও বিবাহিত পুরুষের প্রেমের ঘটনাব্যাখ্যানে—যার সামনে 'শাস্ত্র মূক'। 'রজনীর' গৌরব কাহিনী-

কথকদের স্বাধীনতা অর্পণে। প্রত্যেকের উত্তমপুরুষে যে অনমুমেয় জটিলতার ঠিকানা আছে—'রজনী'র আঙ্গিকরীতিতে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। তবু লবঙ্গলতা পরাভূত নায়িকা। শুধু পরাভূত নয়—শুধু পরাভূত হলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। পরাভূত তো বঙ্কিমের কত নায়িকাই, কিন্তু তারা কেউ পরাজয়কে প্রথম থেকে স্বীকার করে নেয় নি। না পদ্মাবতী, না কুন্দ, না রোহিণী —এমন কী হীরা যে হীরা সেও নয়। কিন্তু লবঙ্গ, বঙ্কিমের প্রথম কলকাতার মেয়ে, অত সম্ভাবনাময়, সে কেন প্রথম থেকে এত আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত। বঙ্কিমের অন্য নায়িকাদের সঙ্গে লবঙ্গলতার প্রধান যে তফাত আমাদের প্রথমেই নজরে পড়ে তা হল হিসেব তাদের বড়ো একটা কারো আসে না। লবঙ্গলতা প্রথম থেকেই হিসেবি। পাকা হিসেবি যে সে প্রকৃত হিসেব চাপা দিতেও পারে। লবঙ্গলতা অন্তত চেয়েছিল তাই। প্রথমটা মনে হয় বাস্তব সম্বন্ধে লবঙ্গলতা বুঝি অন্ধ। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে কোন্ অলৌকিক সন্ন্যাসী এ অন্ধত্ব দূর করবে? তারপরেই বোঝা যায় সে মোটেই অন্ধ নয়, সে রীতিমতো চক্ষুষ্মান। সে অত চক্ষুষ্মান বলে সন্তর্পিত সতর্কতায় নিজেকে আবৃত করেছে প্রতি পদক্ষেপে। (এখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা সংক্ষেপে সেরে নিই। অমরনাথ একেবারে প্রথমটায় ছিল লবঙ্গলতার শিক্ষক। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্কের অবাঞ্ছনীয় উপসর্গটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম অবহিত হলেন।) প্রথম থেকেই সে যেন কী একটা বোঝাতে চাইছে, যা সে নিজে ঠিক বোঝে না। প্রথমটা মনে হয় সে বুঝি আর কাউকে বোঝাতে চাইছে—পরে ধরা পড়ে, না তা নয়, তার লক্ষ সে নিজেই। আরো নজরে পড়ে—লবঙ্গলতাই বঙ্কিমের একমাত্র নায়িকা যে নড়েনা, চড়েনা—'মুভ' করে না। সে দাঁড়ে বসা পাখির মতো কথা বলে মাত্র। ডানা ঝাপটায় না।

'চন্দ্রশেখর' আর 'রজনী' সামান্য ব্যবধানে লেখা। শৈবলিনী ও লবঙ্গলতাকে সেজন্য একবার পাশাপাশি রাখা দরকার। এইজন্য আরো দরকার যে, এই দুই বিবাহিতা নারীর মধ্যে শৈবলিনী স্পষ্ট ভাষায় ও লবঙ্গলতা নাতিপ্রচ্ছন্নভাষায় একথা নিজ নিজ প্রেমাস্পদকে বলেছিল যে, তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের নয়। দুজনের জীবনের অশান্তির মূলে রয়েছে সমাজের হস্তক্ষেপ। কিন্তু মিল এ পর্যন্তই। নিজ প্রয়াস ও পরাজয়ে শৈবলিনী এক—পরাজয়ের মাঝখানে বিজয়িনীর অভিনয়ে লবঙ্গলতা আর এক। ইতিহাসের সন্ধিলগ্নের পটভূমিকায় এক রাজ-নৈতিক ডামাডোলের মাঝখানে শৈবলিনীর দুঃসাহসী ঘোরাফেরা। ঊনবিংশ

শতাব্দীর কলকাতার বনিয়াদি কায়স্থ পরিবারের আড়ষ্ট অন্তঃপুরজীবনে লবঙ্গলতার অধিষ্ঠান। তবু একটা প্রশ্ন জাগেই। শৈবলিনীর সাহস না হয় লবঙ্গলতায় প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু লবঙ্গলতার মধ্যে কি তার নিজস্ব বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো সমালোচনাও থাকবে না—যেমন শৈবলিনীর ছিল? একথাও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লবঙ্গলতা চরিত্র-কল্পনায় বঙ্কিমের আয়োজন ছিল সবথেকে বেশি। হিসেবি বুদ্ধির দাপটে, সম্পত্তি-সচেতনতায়, নিজেকে ঢেকে রাখার শিক্ষায়, অধিকার-বোধে, ভূমিকা-সজ্ঞানতায় ও সুদক্ষ সাংসারিক সংলাপে লবঙ্গলতা উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার টিপিক্যাল উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের বধূ। একে যে কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করানো যাবে না, তার স্রষ্টা সে কথা জানতেন। 'আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই'—বঙ্কিমের সমস্ত দ্বিধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শৈবলিনী প্রতাপের সঙ্গে এই শেষ সংলাপে মিথ্যা করে দিয়েছে রমানন্দস্বামীর অলীক শুদ্ধিপ্রয়াস। এরকম সামাজিক অর্থে বিপজ্জনক উক্তি বঙ্কিমের আর কোনো নায়িকা কখনো করেনি। এর সঙ্গে অমরনাথ-লবঙ্গতার শেষ সংলাপটি তুলনীয়। লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলেছিল—'তুমি আমার কে? তা তো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—' অসমাপ্ত এই বাক্যটিকে সে কিছুক্ষণ বাদে সম্পূর্ণতা দিয়েছিল—এই ভাষায়—'লোকে পাখি পুষিলে যে স্নেহ করে ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনো হইবে না।' নির্দিষ্ট শব্দটি অমরনাথেরও কান এড়ায়নি—'ইহলোক'। 'ইহলোক' বা 'এ পৃথিবীতে' বলতে লবঙ্গলতা যা বোঝাতে চাইছে তার অর্থ হওয়া উচিত 'এ সমাজ'। কিন্তু পাখি পোষার উপমায় আমরা বুঝি লবঙ্গলতায় মূল কথাটি নিয়ে অনেক আমতা আমতা করছে। সন্দেহ হয় লবঙ্গলতার সুখের বিজ্ঞাপন, স্নেহের বিজ্ঞাপন এবং এইসব উক্তি বুঝি শৈবলিনী রচনার জন্য বঙ্কিমের নিজের প্রায়শ্চিত্ত। অমরনাথ-রজনীর ব্যাপারে লবঙ্গলতার উদ্বেগ আমাদের স্পর্শ করল না এইজন্য যে, অমরনাথ প্রসঙ্গে লবঙ্গলতাকে আমরা কখনও সমর্থন করতে পারি নি। সম্পন্ন পরিবারের বউ মালিকানার প্রশ্নে খুবই সজাগ। শুধু রজনীর সম্পত্তি দখলে রাখার জন্যই যে সে উদ্বিগ্ন ছিল তাই নয়। লবঙ্গলতার পোড়ো জমি অমরনাথ—সেখানে আর কেউ আবাদ করবে, লবঙ্গলতার সম্পত্তিবোধ এখানেও পীড়িত ছিল। তাই লবঙ্গলতার অমরনাথ-অনুভূতি আমরা কোনো সময়ে বিশ্বাস করতে পারি নি। অশ্রুগদ্‌গদ্ মুহূর্তেও না। তার দম্ভ, তেজ সবই বালিকাসুলভ প্রদর্শনপরায়ণ আচরণ।

নানা বিখ্যাত বঙ্কিমি স্ববিরোধের একটির দিকে এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৮৭৪-১৮৭৯ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিলেন, তারই পরিণতিতে যেমন তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞানের অন্তত তখনকার মতো সবথেকে আধুনিকতম ধারণায়, তেমনি এই সময়ের মধ্যেই তাঁর চিন্তায় এবং চেতনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের বীজটিও উপ্ত হয়েছে। একথা ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্র যে সোশ্যালিজম্-এর কথা বলেছেন তা "প্রথম আন্তর্জাতিক"-এর সমাজতন্ত্রবাদ। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় যে কোনো হাতফেরতা আকরগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট মার্কসীয় অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যেমন মার্কস কথিত primitive accumulation-এর তিনি বাংলা করেছিলেন আদিম সঞ্চয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে বঙ্কিম তাঁর সোশ্যালিজম্-এর পক্ষপাতী ন্যায়সূত্র ব্যবহার করে হিন্দু সোশ্যালিস্ট হয়ে উঠলেন না। বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা বঙ্কিমকে জাতীয়তাবাদী হতেই বাধ্য করেছে। বঙ্কিম 'সাম্য' (১৮৭৯) লেখার পরে যখন দেখলেন যে, সাম্য হিন্দু ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তখনই তিনি 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার বন্ধের পথে পা বাড়িয়েছেন। অন্তত, বঙ্কিম সেদিন যা অনুধাবন করেছিলেন তা হল এই, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ জাতীয়তাবাদী হতে পারে না। ১৮৭৫-এর আগেই তিনি যখন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রবন্ধগুলি লিখছেন, তখন যে বঙ্কিম "বিড়াল" প্রবন্ধটি রচনা করলেন, আর যে বঙ্কিম "আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধটি রচনা করলেন—এই দুই ধারার কোনো সিনথেসিস্ বঙ্কিম রচনা করতে পারলেন না। বরং পরবর্তীকালে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে যে, এই দুই ধারা অ্যান্টিথেটিক্যাল। সে কারণেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করেছিলেন। ১৮৭৫-১৮৭৯-র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদৃষ্টি এইভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই শ্রেণীর বাঙালি মধ্যবিত্তকে নায়ক-পদে অভিষিক্ত করেননি যারা অগ্রগী সামাজিক চেতনার পতাকাবাহী। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো নায়ক ছাত্র নয়—রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নায়কই হয় ছাত্র, নয় সবে কলেজসীমা লঙ্ঘন করেছে। সমাজের যে-অংশে তখনকার সীমাবদ্ধ এবং যৎসামান্য গতিশীল সামাজিক আন্দোলন চলছিল, বঙ্কিম সেখান থেকে কখনো কোনো নায়ক আহরণ করেননি। বরঞ্চ দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়কার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তখনকার সামাজিক আন্দোলনের উলটাদিকে দাঁড়িয়ে আছে। বহু-পত্নীক স্বামীর সংসারেও নারী যে স্বামীগরবিণী হয়, লবঙ্গলতাকে দিয়ে বিস্ময়কর

অতিভাষণ করিয়ে বঙ্কিম তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এটা পরোক্ষে বহুবিবাহ-বিরোধী আলোড়নেরই বিপক্ষতা। কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণী দুজনকে দিয়েই তিনি দেখালেন বিধবার বিবাহ-বাসনা ও প্রেমাতুরতা শেষ পর্যন্ত নিহত হয়ে নিঃশেষিত। এ সমস্তই আর কিছু নয়—যে সামাজিক আন্দোলন তখন যাহোক-তাহোকভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল, জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমের মনে হয়েছিল তা ঐতিহ্যবিরোধী। এ কারণেই তাঁর নায়ক মাত্রেই অত্যন্ত নেতিমূলক চরিত্রকল্পনা। নায়িকাদের মধ্যেও তিনি তপ্ত লোহা একবারই ধরেছিলেন, তা শৈবলিনী। এবং তা ধরেই ছেড়েও দিয়েছিলেন।

নায়কদের মধ্যে বঙ্কিমের স্বকালকে মূর্ত করছে অমরনাথ—সে যেন সেই সময়ের অর্জিত বিষণ্ণতার প্রতিনিধি। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, অমরনাথ-কল্পনায় তিনি তাঁর আদর্শ অনুযায়ী সমস্ত গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এ সমস্ত কথার কোনোটাই ভুল নয়। কিন্তু তাহলেও একটা কথা থেকেই যায়। অমরনাথ কোন্ অচরিতার্থতার বিগ্রহ? কিছুটা অনুমান করতে পারি যখন আমরা অমরনাথের আত্মকথায় পড়ি:

> পর কেবল বহির্জগতের কর্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য জগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি?

তখন আমরা বুঝতে পারি বহির্জগতে পীড়িত, প্রবল মনুষ্যতাবাদী স্বাধীনতা অভিমানী এক যুবকের লেখনী থেকে কথাগুলি বেরিয়েছে। 'রজনী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে "অমরনাথের কথা"র তৃতীয় পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃতির যোগ্য। এ পরিচ্ছেদে স্বীয় পুরুষার্থের অবৈকল্য খুঁজে ফিরেছে এক যুবক। সে যুবকের অভিজ্ঞতার যা মূল কথা, তার বীজ রয়েছে বঙ্কিমেরই আত্মসমীক্ষায়। প্রায় একই সময়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর "আমার মন" রচনায় 'রজনী'-র দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত অমরনাথের আত্মবিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যাবে। 'প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইবে আমি কি খুঁজি'—এ প্রশ্ন অমরনাথেরও, এ প্রশ্ন কমলাকান্তেরও। কমলাকান্ত এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হয়েছিল স্থায়ী সুখ ও অস্থায়ী সুখের পার্থক্য নির্ণয়ে। তার শেষ সিদ্ধান্ত ছিল, পরসুখ বর্ধন ব্যতীত সংসারে স্থায়ী সুখের অন্য মূল নেই। অমরনাথ কিন্তু প্রশ্নটিকে অধিকতর যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে

যেতে পেরেছিল। 'আমার কাম্য বস্তুর অভাবই আমার দুঃখ'—এ কথা যখন অমরনাথ বলে তখন সে তার স্বশ্রেণীর নেতিমূলক নিষ্ক্রিয়তার প্রায় প্রতিনিধিত্ব করে বসে। 'আমার কাম্য বস্তুর অভাব' এই বোধ থেকে অমরনাথের স্রষ্টা, তথা কমলাকান্ত পৌঁছেছিলেন অন্তত তাঁর অনুভূত তৎকালীন রঙিন উদ্দেশ্যচারী বিষণ্ণতা থেকে দেশানুরাগের সুদৃঢ় তত্ত্বে। অমরনাথকে উপন্যাসে সে অবকাশ দিতে পারলে সে একটা ইতিবাচক চরিত্রে রূপান্তরিত হত। উপন্যাসে সে অবকাশ ছিল না। আর, সমকালীন মধ্যবিত্তকে দিয়ে সে তত্ত্বের কর্মময় মূর্তি গড়ে তোলার সাহসও তাঁর ছিল না। আবার যদি প্রতাপের পাশে অমরনাথকে রাখি, তাহলে এই একই সময়ে পরিকল্পিত বঙ্কিমের দুই নায়কের ভিতর দিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার অসহায়তাকে কিছুটা হৃদয়ংগম করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুভূতি ক্ষীণ হলেও প্রত্যক্ষ ছিল যে, ইংরেজের গড়া রিপোর্ট যাদের দস্যু বলে ঘোষণা করেছে, তাদের অননুবর্তিতার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাই প্রতাপ দস্যু, ভবানী পাঠক দস্যু, সত্যানন্দ দস্যু। আরো লক্ষণীয়, এই তিন দস্যুরই প্রধান প্রতিপক্ষ অত্যাচারী রাজশক্তি—ইংরেজ-শক্তি। 'ইংরেজ জাতিকে বাংলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য'—একান্ত ব্যক্তিগত কারণে হলেও প্রতাপের সিদ্ধান্ত ছিল কিছুটা জাতিবাচক। 'এইরূপ অনিষ্ট (ইংরেজ) আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে'—এ জাতীয় ব্যাখ্যায় তার সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত সীমাকে লঙ্ঘন করে যায়। প্রতাপের, ভবানী পাঠকের এবং সত্যানন্দের চরিত্র-নিয়তির সাদৃশ্যটুকুও অনুধাবনীয়—এরা প্রত্যেকেই প্রাণ বিসর্জনের জন্য আকুল ছিল। ইংরেজের অধিকৃত ভূমি বাসোপযোগী নয়—এ বোধ যেন এদের চঞ্চল করে তুলেছিল। এদের কাম্যবস্তু ছিল ইংরেজ বিদায়। সেজন্যই কিন্তু এত যন্ত্রণার মধ্যেও এরা কেউ বিষণ্ণচিত্ত ছিল না। 'আমার কাম্যবস্তুর অভাব'—একথা প্রতাপ, ভবানী পাঠক বা সত্যানন্দের নয়। তাদের সকলের সামনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য তাদের মরতে পাঠিয়েছে বটে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও 'স্ট্যাটিক' করে তোলে নি। অমরনাথ যে শ্রেণীর মানুষ, যে যুগের মানুষ, সে যুগের বাঙালি যুবকের সামনে আত্মপ্রতিষ্ঠার অনেকগুলি পথ খোলা ছিল। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম অমরনাথের মতো সচেতন ব্যক্তির কাছে সেই পথগুলির সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই ধন যশ জ্ঞান—প্রতিযোগিতাপরায়ণ আধুনিক জীবনের দৌড়ের নানা ক্ষেত্র সত্ত্বেও, অমরনাথ ম্লান।

আরো দেখি, প্রতাপের জীবনে ভালবাসার অভিঘাত আগুন হয়ে জ্বলে

উঠেছে। কিন্তু অমরনাথের জীবন সম্বন্ধীয় চেতনা প্রথমাবধি নেতিবাচক। সে নিজের জন্য বা প্রেমাস্পদের জন্য প্রতাপের মতো স্বনির্দিষ্ট পথ নির্বাচন করতে পারে না। যে হিতবাদের ক্ষীণ জের তার শেষ দিককার যাবতীয় করুণ সিদ্ধান্তের মধ্যে ছায়া ফেলেছে, তা পরাভূতের আত্মসান্ত্বনা মাত্র। সুতরাং অমরনাথ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গতিবেগসম্পন্ন নায়ক প্রতাপ। আগে অথবা পরে এ জাতীয় নায়ক নিয়ে কাজ বঙ্কিম করেন নি। প্রতাপের পর—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলি শৈবলিনীর পর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেসব নায়ক-নায়িকা এসেছে, তারা ঠিক ওই ডাইমেনৃশন আর পায় নি। নায়কদের ব্যক্তিগত জীবন এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিব্যাপ্ত ঘটনার সংযোগে এক বিস্তৃত জীবনের কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্র আর করে উঠতে পারেন নি। তিনি যদি অমরনাথ চরিত্রকল্পনায় যে পাংশুতা এবং সংকীর্ণতা রয়েছে তা ঘোচাতে পারতেন, তাহলে অমরনাথই হত তাঁর সর্বোত্তম আধুনিক চরিত্র। কিন্তু অমরনাথ দেশত্যাগ করে এবং গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ করে একথাই প্রমাণ করল যে, তাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া ব্যাপারটার মধ্যেই একটা দৈন্য ছিল। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। বলা হয়ে থাকে এটি তাঁর সব থেকে সুলিখিত উপন্যাস। কথাটি মিথ্যা নয়। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে নেই। এ উপন্যাসের মূল সমস্যা নৈতিক সমস্যা। সে নৈতিক সমস্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাত ট্রাডিশনের দিকে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সেটা ছিল না তা নয়, কিন্তু যেভাবে হোক 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনী তাদের স্রষ্টার সচেতন অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে গিয়েছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তিনি প্রথম থেকেই চরিত্রগুলিকে এমন-ভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন যে, তারা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছে এক একটি মূল্যমানের প্রতিনিধি। সে কারণেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ব্যক্তিজীবনগুলি যেমনভাবে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে 'চ্যালেঞ্জ' করতে পেরেছিল—অন্তত চেষ্টাও করেছিল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তা কেউ করে নি। এ উপন্যাসে সে কাজ করার কথা ছিল একজনের, সে রোহিণী। বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত রোহিণীর মধ্যে ট্রাজিক দীপ্তির পূর্বাভাস লক্ষণীয়। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই সে দীপ্তিটি নিবিয়ে দিলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য-জীবনের স্থায়িত্বটাকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহ্য-অনুসারী চেতনায় আঁকড়ে ধরেছিলেন। অর্থাৎ শৈবলিনী থেকে ধীরে ধীরে বঙ্কিমচন্দ্র পিছিয়ে আসছিলেন।

আর, প্রতাপ থেকে তো পিছিয়ে আসছিলেন বটেই। এরপরে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে কতকগুলো তত্ত্বের প্রতিমা পেয়েছি। কিন্তু জীবন প্রতিমা আর পাইনি। এ পশ্চাদপদসরণের কারণটি অনুধাবনীয়।

শৈবলিনী-রোহিণী-কুন্দনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রমালায় এমন সব ব্যক্তি-কল্পনা যেখানে সত্তা-সমাজের বৈরিতার বিষয়টি বঙ্কিম ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু আগেই বলেছি এই বৈরিতার বিষয়টিকে প্রশ্রয় দিতে বঙ্কিমচন্দ্র পারেন না। কারণটা শুধু এই নয় যে, বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানদের স্থায়িত্ব সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রও অংশীদার ছিলেন। কারণটা শুধু এও নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-কল্পনা আত্মরক্ষা-মূলক। কারণ বরঞ্চ এই যে, তাঁর কাছে যে সিন্‌থেসিসটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে-ছিল, তার মূল কথাটা ছিল দেশপ্রীতি। আর তাঁর দেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য লক্ষণ ইতিহাস-প্রীতি। কিন্তু তাঁর ইতিহাস চেতনার প্রধান সীমাবদ্ধতা এই যে, সে চেতনা ছিল আদর্শান্বিত এবং ভাবাত্মক। হয়তো একজন দেশপ্রেমের প্রথম প্রবক্তার পক্ষে এছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা পরাধীনতার স্বরূপ অধ্যয়নে ভুল করলেন। কিন্তু ভুল সত্ত্বেও তাঁর আবেগের অকৃত্রিমতায় আমরা সন্দেহ করতে পারি না। সেই আবেগ থেকে তিনি উপনীত হলেন তাঁর দেশতত্ত্বে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লেখার আগেই তাঁর এই দেশপ্রীতির তত্ত্ব জায়মান হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব থেকে বঙ্কিম তাঁর অনুশীলন তত্ত্বে পৌঁছলেন না—এই তত্ত্বকে দাঁড় করানোর জন্য তিনি অনুশীলন তত্ত্বের দীর্ঘ চর্চা শুরু করলেন। যখন তাঁর মনন ও চেতনা এই লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হতে থেকেছে, তখনই তিনি বিদায় দিলেন তাঁর সমকালীন মধ্যবিত্ত পাত্র-পাত্রীদের। তখন তাঁর অমরনাথ অথবা গোবিন্দলালকে দিয়ে বা সেই শ্রেণীর চরিত্র পাত্রকে দিয়ে সে দেশতত্ত্বের প্রতিমা রচনা সম্ভব নয়। পরোক্ষে বঙ্কিম বুঝেছিলেন, তাঁর উপলব্ধ ও অর্জিত দেশতত্ত্বের পক্ষে এদের জীবন অতীব সীমিত। ত্রয়ী উপন্যাসে তিনি তাই আবার ফিরে গেলেন ইতিহাসের পটভূমিকায়। সেখানে সিপাহি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক তটস্থতায় তাঁকে বিব্রত থাকতে হবে না। সেখানে এ স্বাধীনতা ব্যবহার করতে গিয়েও তিনি জানলেন একজন সচেতন মধ্যবিত্তের পরাধীনতার বিড়ম্বনা কত দুর্ভেদ্য। তাই তাঁর নায়কদের এত মনগড়া তত্ত্বের কুয়াশায় আত্মগোপন, এত আপস। এই পরিস্থিতিতে যখন বুঝলেন, ঝাঁসির রানিকে নিয়ে উপন্যাস লেখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না—বুঝলেন যে 'আনন্দমঠ' নিয়ে আপসের স্মৃতি পীড়াদায়ক—তখনই তিনি উপন্যাস-

ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন।

অথচ শক্তি যে তাঁর তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ' তাঁর প্রমাণ। চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ'-এর প্রকাশ কাল ১৮৯৩। ততদিনে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯৬) লেখা হয়ে গেছে। লেখা হয়ে গেছে 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ সবের কোনো কিছুর প্রভাব 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নেই। মোহিতলাল এ বিষয়টি আবেগময় ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎচন্দ্র বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করেছেন। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারী মবারক জেবউন্নিসা, ঔরঙ্গজীব-নির্মলকুমারী—এইসব কোনো আখ্যান বা এপিসোডের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বময় পরিণামের কোনো যোগ নেই। ১৮৯৩—আর এক বছর তাঁর তখন বাকি আছে। যবনিকা কম্পমান। ঠিক এই সময়ে তিনি নতুন 'রাজসিংহ' লিখলেন। সে ইতিহাস অদূরবর্তী অতীতের বঙ্গদেশের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস নয়, ব্যর্থপরিণাম বিদ্রোহের ইতিহাস নয়। সেই ইতিহাসবিধৃত কাহিনীতে কোনো আবশ্যিক কালানৌচিত্য সৃষ্টির দরকার হল না। তা হলে লিখতে পারছিলেন না তিনি—একথা ঠিক নয়। লিখতে তিনি পারছিলেন—প্রতিভা তাঁর অক্ষুণ্ণই ছিল। কিন্তু তিনি লিখছিলেন না। কেন লিখছিলেন না, সেটা অনুধাবন করতে গেলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে তাঁর শেষ কয়েক বছরের নিরুপায় অথচ নির্ভুল উপলব্ধির দিকে। দেশপ্রীতি ছাড়া তখনকার ভারতবাসীর আর কোনো আঁকড়ে ধরার মতো ধর্ম নেই—এই তাঁর শেষ উপলব্ধি। অথচ একে নিয়ে আর তাঁর উপন্যাস লেখার সাহস নেই। এগার বছর পরে এসব থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি লিখলেন নতুন 'রাজসিংহ'—তা শুধু তাঁর নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি মাত্র। এও পশ্চাদপসরণ বই আর কী! অথচ মুচিরাম গুড়ের গল্প শোনাতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র তো ঠিকই বুঝেছিলেন ইংরেজ শাসনের ভিতরকার কথা। এই ব্যঙ্গ উপন্যাসে বর্ণিত সমস্ত কাহিনীটি থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কয়েকটি ব্যাপার :

এক. গোটা প্রশাসনের পঙ্ক পুরীষ এক অজিয়ান আস্তাবল।

দুই. ভারতীয় জমিদার এবং রাজা বাহাদুরদের সম্বন্ধে নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারণা অতীব প্রতিকূল। সমগ্র রচনাটি তার প্রমাণ।

তিন. কলকেতিয়া হবার বাসনার মধ্যে এক সামূহিক আত্মপ্রবঞ্চনা।

চার. ইংরাজ প্রশাসক নামায়েতেই হয় অপদার্থ, নয় দাম্ভিক এবং তারা পূর্বোক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাধা দিতে পারাকেই পুরুষার্থ বলে বিবেচনা করেন।

পাঁচ. অপদার্থ অধিকতর অপদার্থকে প্রশ্রয় দেয়। যে যত অপদার্থ সে তার লাঙ্গুলের দৈর্ঘ্যের জন্য তত বেশী দর্পিত। রাজা বাহাদুর টাইটেল সেই লাঙ্গুল।

এই কমলাকান্ত স্রষ্টা, অমরনাথ স্রষ্টা, মুচিরাম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে অযাচিতভাবে দেওয়া হয়েছিল 'রায়বাহাদুর' উপাধি। মুখবুজে বঙ্কিমচন্দ্রকে তা সহ্য করতে হয়েছিল। চাকুরিয়ার ঔপনিবেশিক কেরানি রক্তের গঞ্জনা থেকে তাঁরই বা মুক্তি কোথায়!

চার

গত শতাব্দীর অন্তিম দুই দশকে একদিকে যেমন সামাজিক নেতৃত্ব অর্জনে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রয়াস সম্পূর্ণ হল, জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্কুরোদ্গম হল, ইংরাজি জানা ভদ্রলোকেরা জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধের প্রধান প্রচারক হয়ে উঠলেন—অপরদিকে মধ্যবিত্তের নিজের সংকটও তখন ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে থাকল। তার সংকটের দুই মূল—একটা মূল তার আত্মসংশয়ে—আরেকটা মূল ছিল তার শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতায়। জীবনের মাত্রামান যদি বিচলিত হতে শুরু করে তা হলে উপন্যাসের মতো জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্পকর্মেও রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। ব্যাপারটা আমরা সব থেকে ভালো বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ঔপন্যাসিক যিনি উপন্যাস লিখেছেন যতখানি না শিল্পের তাগিদে, তার থেকে বেশি জীবনের তাগিদে। জীবনের এমন কতকগুলি সমস্যা সংকট ও সন্ধিকালকে তিনি সামাজিক মানুষ হিসাবে অনুভব করেছিলেন যেগুলির কথা তিনি অন্য কোনোভাবে বলতে পারতেন না। কালসংকট তাঁর সময়ে ভিতরে বাইরে আরো জটিল হল। তার মোকাবেলা করতে গিয়ে তাঁর হাতে পুনঃপুন টেকনিকের নবায়ন।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত উপন্যাসের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আজ আমাদের আরো বেশি নজরে পড়ছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্মলগ্ন থেকে অসংগতির যে জট পাকানো রয়েছে, স্বাভিজ্ঞান সন্ধানের শ্রেণীগত প্রয়াস কোন্ আত্মকেন্দ্রিকতার চোরাবালিতে শেষ পর্যন্ত ডুবে মরে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত উপন্যাস-গুলিতে সে সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে বালজাকের বা টলস্টয়ের মতোই রবীন্দ্রনাথও দেশকালের সঙ্গে সংগত থেকেই নাগরিক মধ্যবিত্তের সাধ ও সাধ্যে, তার প্রেরণা ও পিছুটানের, তার চ্যালেঞ্জ ও আপসের

আশ্চর্য আলেখ্য এঁকেছেন। 'চোখের বালি' এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে। আমরা আজ কালোচিত প্রেক্ষণী ব্যবহার করে এ উপন্যাসের কাঠামোর নিহিত ন্যায়সূত্র বা লজিকটি অনুধাবন করতে পারি। উপন্যাসটি যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে, তাও বুঝতে পারি। রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে চিনত পুত্র হিসাবে, মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে জানত মা হিসাবে। মহেন্দ্র বিহারীকে জানত, বিহারী মহেন্দ্রকে—বন্ধুকে বন্ধু যেমন জানে চেনে সেভাবে। আশা বর হিসাবে জেনেছিল মহেন্দ্রকে। মহেন্দ্র তার শ্রেণীবুদ্ধি অনুযায়ী আশাকে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ চিনেছিল। কিন্তু এদের সবার কাছেই বিনোদিনী ছিল সম্পূর্ণ অজানা। বিনোদিনী যখনই তার সমাজ প্রদত্ত নামরূপ ভাঙতে আরম্ভ করেছে, তখন এরা প্রত্যেকেই বুঝেছে বিনোদিনীকে তারা কেউ চেনেনি। একে নিয়ে কী করতে হয় তা তারা কেউ জানে না। রোহিণী নয়, কুন্দ নয়, সে মাত্র বিধবা তরুণী নয়। সে একটা নতুন সমাজসত্তা বা আইডেনটিটির প্রতিনিধি। নতুন যুগসত্য যেমন তখনকার বাঙালি মধ্যবিত্তের অসংগঠিত অস্তিত্বের মাঝখানে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে, সেই অসংগঠিত অস্তিত্বও যেমন সেই নতুন উপলব্ধিকে আহ্বানে ও প্রত্যাখ্যানে দ্বিধাসংকটে পীড়িত—বিনোদিনী সম্বন্ধে মহেন্দ্র বিহারী ঠিক সে জাতীয় অসমাধানে লাঞ্ছিত। একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদে বাসনাকুহেলি বিবর্ণ মহেন্দ্র চেতনার দর্পণে বিনোদিনী এভাবে প্রতিফলিত :

> "নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে—তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা—কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই বিনোদিনী।... আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—'ওগো পার করো গো'—খেয়া নৌকার জন্য সে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে—'ওগো পার করো'।"

মহেন্দ্র এই বর্ষাবিহ্বলতায় অন্তত একবারের জন্যও বিনোদিনীর স্বাভিজ্ঞানের ব্যাকুলতাকে তার নিজ অর্থে অনুমান করতে পেরেছে। পারলে কী হবে—মহেন্দ্র মহেন্দ্রই। অতীত ভবিষ্যৎ বর্ষার জলে ভাসিয়ে দিয়ে মহেন্দ্র চায় বিনোদিনীকে নিয়ে বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী আসন। এখানেই বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের প্রভেদ। ৪৮-সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিহারীর ভাবনা ছিল অন্যরূপ :

"বিনোদিনী যে সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের

মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যর উপযুক্ত কোন সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে।”

বিনোদিনীকে ঘিরে মহেন্দ্রভাবনা ও বিহারীভাবনার বৈপরীত্য একথাই প্রমাণ করে যে বিনোদিনীর মৌলিক সত্তা মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় করেছে। উনিশের শতকের উত্তরাধিকারপুষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্তের দুই দিক—আত্মকেন্দ্রিকতা ও প্রত্যক্ষবাদ—মহেন্দ্রের এবং বিহারীর জীবন চর্চায় ব্যক্তিরূপে প্রমূর্ত। মহেন্দ্রের সব বিধানের বাইরে যেতে চাওয়া সে কারণেই রোমান্টিক বিদ্রোহাচরণ নয়। বিহারীর ‘উপযুক্ত সম্বন্ধ কল্পনা’ নয়, ক্লাসিক সংযমে নিজেকে বাঁধার প্রয়াস মাত্র। মহেন্দ্রের রক্তে বইছে আহত অভিমানীর ভাঙনের নেশা। বিহারী সমস্ত অসংগতির মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে সংজ্ঞার্থের নির্দিষ্টতা।

‘চোখের বালি’ উপন্যাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি স্বতই আকৃষ্ট হয়। এতাবৎ যত উপন্যাস লিখিত হয়েছে—রোমান্সের দুটি একটি স্বল্প ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বলছি, সবগুলিরই ঘটনাবৃত্তের সমাপক দায়িত্ব পুরুষের হাতে অর্পিত ছিল। পুরুষপ্রধান মধ্যযুগীয় পারিবারিক প্যাটার্নের জের পুরুষপ্রধান বুর্জোয়াভাবনাদীপিত সমাজে যে রূপান্তরের বহুবিধ বিচিত্রতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নানামুখী উদ্ভাসন ও ক্ষণায়ু চমকের মধ্যেও ছায়া ফেলে, ইতিপূর্বের উপন্যাসগুলিতে নায়কান্ত সংবৃত সমাপ্তি সে কথাই প্রমাণ করে। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের নায়িকান্ত বিবৃত সমাপ্তি (open ending) ভিন্ন কথা বলে। সমাপ্তিটি নানাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার প্রধান হল বিনোদিনীর নিজেকে খুঁজে পাওয়া। এ উপন্যাসের সমুদয় প্রধান সিদ্ধান্ত বিনোদিনীর। সমুদয় প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বিনোদিনীর। শেষ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে বিনোদিনীই। বাংলা উপন্যাসে এমন নায়িকাঘটিত সমাপ্তি এর আগে এত সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণতা পায়নি। উপন্যাসটির আধুনিকত্বের একটি বড় অভিজ্ঞান সে,—বিহারীর সংজ্ঞার্থ সন্ধানের প্রস্তাবে তার রাজি না হওয়া, বিহারীর জনহিতকরকর্মে তার যথাসর্বস্ব দান—বিনোদিনীর যন্ত্রণাকে উত্তীর্ণ করেছে অন্যমাত্রায়। বিনোদিনীর বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবে রাজি না হওয়া ও চণ্ডালিনী প্রকৃতির শেষ সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য এখানে আমাদের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে। জল দিতে পারাটাই বড়ো কথা। তারপর কুহকমন্ত্রে জয়ের টেক্কা তুরুপ করা জয়কে হেয় করা। একথা বিনোদিনীই প্রথম বলেছে।

‘চণ্ডালিকা’র প্রকৃতি পদ্ধতির গ্লানিকে পদাঘাতে চূর্ণ করল, সে বুঝল তার বিশুদ্ধ সম্বিতের জাগরণে কামনাকুহকের আর কোনো ভূমিকা থাকবে না।

আনন্দকে যে প্রণাম করে সে সর্বত্যাগিনী। বিনোদিনী নিশ্চয়ই প্রকৃতির উপাদানে কল্পিত হতে পারে না—হবার কথাও নয়, তবু সেও নিজের সৃষ্ট অগ্নিকুণ্ড পার হতে হতেই বুঝেছে কোথায় তার পদ্ধতির গ্লানি। সে যখন খাদটুকু পুড়িয়ে নিজের স্বর্ণশুদ্ধতার সন্ধান পেল তখন 'চণ্ডালিকা'র প্রকৃতির মতোই সে তার আনন্দের কাছে সম্মিলিত প্রণামের সঙ্গে নিজের প্রণাম মিশিয়ে দিল।

এই উপন্যাসে বিনোদিনীর বাচনিক স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উত্তেজিত বাচনিক বিস্ফোরণে সে প্রায়ই নাটক, থিয়েটার বা খেলার উপমান ব্যবহার করেছে। সে যেন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চায় সে রোমান্সের নায়িকা নয়—সে অবিমিশ্র বাস্তব। বিহারীর মুখ থেকেই আমরা শুনি 'আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি—সে লজ্জার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' এই প্রত্যাখ্যান বুঝিয়ে দিল, যে নারী হৃদয়ের গহিনের কস্তুরীর সন্ধান পেয়ে যায়, বিধবাবিবাহ নামক এক ঊনবিংশ শতাব্দের প্রাগম্যাটিক মীমাংসার দরকার তার আর হয় না। এই অবিবাহ যে কোনো সামাজিক বিবাহের চেয়ে প্রগাঢ়। বিদ্রোহের থেকেও এ আত্মসম্ভ্রম অনেক বেশি প্রথাবিমুক্ত পদক্ষেপ।

পাত্রপাত্রীর আধুনিক অস্তিত্বের যন্ত্রণা থেকেই ঔপন্যাসিক সংগ্রহ করেন তাঁর জীবন সংক্রান্ত নতুন ভাষ্যের সূত্র, তা খুঁজতে গিয়েই তিনি সংগ্রহ করেন তাঁর উপাদান। এই যন্ত্রণার মূলে থাকে ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত শুদ্ধতার সঙ্গে সময়ের সংঘর্ষজনিত সংকট। রবীন্দ্রনাথের সকল উপন্যাসের সংকটগুলির স্বরূপে যে পার্থক্য তার অনুক্রমিক একটা বহিঃরেখা এক নজরে দেখতে পেলে উনিশের শতকের বাঙালির মধ্যবিত্তের, তথা বিকাশের দিক থেকে অপূর্ণ বুর্জোয়াতন্ত্রের মধ্যেও নৈতিক সংগ্রামের একটা ছবি পাওয়া যায়। সে মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত চুম্বকে দেখা যায় :

'চোখের বালি' (১৯০৩)—নতুন আত্মজিজ্ঞাসার সংকট।
'নৌকাডুবি' (১৯০৬) —দায়িত্বের সংকট।
'গোরা' (১৯১০)—বিচ্ছিন্নতার সংকট।
'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)—পরীক্ষার সংকট।
'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)—সাধ্যসাধন সংকট।
'যোগাযোগ' (১৯২৯)—স্বাতন্ত্র্যের সংকট।
'শেষের কবিতা' (১৯২৯)—অমূলতার সংকট।

'দুইবোন' (১৯৩৩)
'মালঞ্চ' (১৯৩৪) } বুর্জোয়া দাম্পত্যে নারীর সংকট।

'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)—ভূমিকা বিভ্রান্তির সংকট।

উনিশ শতকে অর্জিত নবচেতনার ফলে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়েই পাত্রপাত্রীদের জীবনে এই সংকটগুলি মেঘার্ত হয়ে উঠেছে।

নৌকাডুবির সমস্যার কথাই ধরা যাক। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এই একমাত্র পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রটিকে নানা দুর্বলতার সমালোচকরা চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু দুটি কারণে 'নৌকাডুবি' বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। এক—এই প্রথম একটা উপন্যাস লিখিত হল যা উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের প্যাটার্নের বাইরে এসেছে। এ সর্বার্থে 'অনুনবিংশ'—'চোখের বালি'তেও মহেন্দ্র আশা বিনোদিনী স্মরণ করিয়ে দেবেই সুবিখ্যাত বঙ্কিমী ত্রিভুজ। 'চোখের বালি' প্রতি পদক্ষেপেই যেন বলে দিচ্ছে সে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে সংশোধন করে চলেছে। 'নৌকাডুবি' তা নয়। বিধবা নায়িকার কোনো দরকার এখানে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেননি। বৈধব্য-নিরপেক্ষ এক নিগূঢ় নিয়তি যে একটা নারী-ব্যক্তিত্বকে নীরন্ধ্র বেদনায় ফেলে দিতে পারে তার প্রথম প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে হেমনলিনী। দুই—এক দায়িত্ববোধ যা রমেশের উপর চেপে বসেছে। (সিন্দবাদের তুলনা দিয়েছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) তা নতুনকালের মধ্যবিত্তের অর্জিত দায়িত্ববোধ। একে ফেলে সে পালাতে পারে না। এটা রমেশের শ্রেণীর সততা। সে অর্থে একান্ত আধুনিক সততা। একে সে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো শাস্ত্র-সৃষ্ট অজুহাতে এই দায়িত্ববোধকে সে পরিহাস করতে পারে না—এটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল—স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সে এটাকে পরিহার করতে চায় না। এবং এই সততাবোধ বা নৈতিক ব্যক্তিত্বই তার নিয়তি হিসাবে দেখা দিল। রমেশ হেমনলিনীকে লিখেছিল (৫৯ পরিচ্ছেদে) 'তোমার সহিত আমার যে বন্ধন ঈশ্বর দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন সংসার তাহা ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।' অপরদিকে ঘটনাচক্র কমলার যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল রমেশ তা জোড়া দিয়েছে। কিন্তু এ দু ব্যাপার যুগপৎ ঘটতে ঘটতে রমেশ ও হেমনলিনীর অনেক কিছু ভাঙল। তাদের দিক থেকে উপন্যাসের বিবৃত সমাপ্তি যেন সম্পূর্ণ নাগরিক দুটি ব্যক্তির যোগ্য জীবনসন্ধি। ভিক্টোরিয়ান নৈরক্ত্য এই উপন্যাসের উপযুক্ত অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেয়নি, ব্রাহ্ম নৈতিক পিউরিট্যানিজম্-ও উপন্যাসের সম্ভাবিত

ঝোড়ো বাতাসকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি—এটাই আজকের প্রেক্ষণী ব্যবহার কালে মনে হয় এ উপন্যাসের ত্রুটি। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও 'নৌকাডুবি'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সেই উপন্যাস, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর জের সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এ অনন্যতার তালিকা নির্মাণে তার কথাই প্রথমে উঠবে। তাই 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি'র পরবর্তী রচনা। আমরা লক্ষ করি বিনোদিনীকল্পনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যে আর ফিরে আসেনি। দামিনী বিনোদিনীর কেউ নয়। কিন্তু হেমনলিনীর অনেকগুলি অনুজা আছে।

লুকাচ ঠিকই বলেন, সমস্ত প্রকার সাহিত্যিক কর্ম-ই জীবনসত্যের মাটিতে দৃঢ় ভিত্তি পায়। রবীন্দ্রনাথের কাছেও উপন্যাসের আঙ্গিকরীতির অর্থ ছিল জীবনের গতিময় প্রকৃতিকে নানাদিক থেকে স্বীকৃতি দান। এই স্বীকৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর উপন্যাসের ফর্ম নির্ধারিত হয়েছে। তাই 'গোরা'র বিস্তার সংহত হয়ে আসে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। তাই 'গোরা' সর্বাপেক্ষা সার্থক রাবীন্দ্রিক উপন্যাস হলেও রাবীন্দ্রিকতম উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'। জীবনকে একটা নিশ্চিত লক্ষের দিকে বহমান তরঙ্গ স্পন্দন হিসাবে না বুঝে নিলে তার মূল্যায়ন বা উপলব্ধি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে আজও আমাদের মহৎ ঔপন্যাসিক যে তাঁর প্রধান পাত্রপাত্রীরা সকলেই স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত এবং এই সূত্রেই তারা বুঝেছিল দুটি কথা—১. স্বাধীনতা কী থেকে, এটার চেয়ে বড়ো কথা, কেন। ২. রিয়ালিটিকে পরিবর্তিত করতে পারার স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা। কিন্তু গোরা কি পেরেছিল তার অভিজ্ঞতাগত রিয়ালিটিকে পরিবর্তিত করতে? যে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় সে ছিল উন্মথিত, সে বিচ্ছিন্নতার শিকড় সে খুঁজেছে ঠিকই, তার জন্য সে কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছে, সকলের হয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করেছে—এও ঠিক কথা, কিন্তু লছমির হাতে জল খেতে সম্মতিজ্ঞাপনের সিদ্ধান্তের সবটা কি তার স্বোপার্জিত, না কী, তার জন্মবৃত্তান্তের রহস্য উন্মোচনের ধাক্কায় সে সিদ্ধান্ত অনেকটা অগত্যা হয়েছে—এ প্রশ্ন থেকেই যায়। চরঘোষপুরের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় দগ্ধ এবং নাপিতের মানবিক উদারতার প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা চরমপন্থী যুবক ধীরে ধীরে সামাজিক সংস্কারবাদী হয়ে উঠল, হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাসী। জন্মরহস্যের যবনিকাটি না উত্তোলিত হলে সে কোথায় দাঁড়াত তা আমরা জানিনা। কিন্তু একথা বলার অর্থ নয় গোরার উত্তরণকে গৌণ করা। বরঞ্চ আজকের ভারতবর্ষের সহস্র অন্তঃসারশূন্য বিপ্লবী হুঙ্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হয়, গোরার জন্মরহস্য একটা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পূর্ণ।

সমগ্র বাঙালি তথা ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে (ইংলিশ এডুকেশনাল মিড্‌ল ক্লাশ) গোরার মতোই জেনে নিতে হবে সে জন্মসূত্রে বিদেশী—তাকে অর্জন করে নিতে হবে ভারতীয়ত্ব। এবং সেই সেক্যুলার ভারতীয়কে লছমীর হাতে জল খেতে চেয়েই এ ব্যাপারে প্রথম পাঠ আজও নিতে হবে—আজও, যখন ভারতবর্ষের দূর গ্রামে বর্ণ-হিন্দুদের কুয়োয় তৃষাতুর হরিজনকে জল নিতে গেলে প্রাণ দিতে হয়।

শচীশের কথাও এইভাবেই বিবেচ্য, কিন্তু সে বিবেচনার ফল ভিন্ন। তখনই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসই অরাবীন্দ্রিক নয়, কেননা, এমনকি, 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ধরেই বলছি, তাঁর কোনো দুখানি উপন্যাস এরকম নয়। 'চতুরঙ্গ' ঠিক সেই অর্থে রাবীন্দ্রিক, যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের আর যে-কোনো উপন্যাস রাবীন্দ্রিক। বিহারী, গোরা আর শচীশ মধ্যবিত্ত চেতনার অর্জিত উত্তরাধিকারে একটা কথার আভাস পেয়েছে—বৃহতের সঙ্গে অন্বয় ব্যতীত মুক্তি নেই। কিন্তু এই বোধের মাত্রাটা একরৈখিক নয়। বিহারী ভেবেছিল বৃহৎ জনসমাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গোরা ভেবেছিল আরেকটু বেশি—বৃহৎ জনসমাজের সঙ্গে তার ভেদের প্রাচীর ভাঙার কাজ শুরু করতে হবে। শচীশ ভেবেছিল অসীমের জন্য ব্যক্তিক আকুতিতে সর্বাধিকার দিতে হবে। তখনই দেখা যাবে গোরা ও শচীশ পরস্পরের সম্পূরক। গোরা উপনীত হল ধর্ম নিরপেক্ষ উদার মানবপ্রেমে। শচীশ জ্যাঠামশয়ের ছাত্র হিসাবে শুরুই করেছে সেখান থেকে। তার হিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের গাণিতিক হিসাবে মানুষই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। যুক্তিপন্থী হিতবাদী ভক্তিবাদী হয়ে উঠল যখন তখন আমরা বিস্মিত হইনি। ঊনবিংশ শতাব্দের বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনচর্চায় এ উদাহরণ তো বিরল নয়। বিস্মিত হই শচীশের অনন্যতায়। বিহারী এবং গোরা তাদের শেষ বিন্দুতে জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনী ও সুচরিতার সঙ্গেও মীমাংসাটাকে সম্পূর্ণ করেছে। শচীশের মীমাংসা দামিনীকে বর্জন করে অর্জিত হল। সন্দেহ নেই মুক্তিই সে খুঁজেছে, কিন্তু তা তার নিজের মুক্তি। কিন্তু এখানেই গোরার সঙ্গে তার প্রভেদ। গোরা চেয়েছিল সকল অনন্বয়ের অবসান হোক। শচীশ সীমা ভাঙতে ভাঙতে কোথায় গেল ? সকল সম্পর্কের বাইরে যে চলে যায় সে তো উপন্যাসের ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। শচীশও তাই গেল। আমরা লক্ষ করি একই বছরে 'ঘরে বাইরে' আর 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে রাজনৈতিক চরমবাদের প্রগল্‌ভ প্রতিনিধি

সন্দীপ—আর আধুনিক অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার স্বাধীন সাধক শচীশ। দুটো মেলালে একটা সময়ের ছবি পাই—বাঙালি রাজনৈতিক চরমবাদের প্রথম অধ্যায় এবং তার গৈরিক পরিশিষ্ট শ্রীঅরবিন্দ।

এতক্ষণে আবশ্যিক হয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যবিত্ত নায়কদের সঙ্গে তাঁর নাটকের এক ধরনের অমধ্যবিত্ত চরিত্রপাত্রদের তুলনা। ধনঞ্জয়-দাদাঠাকুর-চন্দ্রহাস বিশু প্রভৃতি চরিত্রপাত্রদের নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা যা কিছু করতে চায় তা জনতাকে সঙ্গে নিয়ে করতে চায়। এরা বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটাতে জনতার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাদের উদ্ভবও জনতার ভিতর থেকে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল পরিবর্তনের সাধক এরাই। 'কালের যাত্রা' সে ভাবনার চরম প্রতিমা। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যবিত্ত নায়করা সকলেই একলা। একাকিত্বে তাদের স্ফুরণ। তারা যে বাস্তবতার প্রতিভূ তা অলীক নয়। কিন্তু তা একান্তই তাদেরই রিয়্যালিটি। এই সব বড়োমাপের নায়কদের প্রাতিস্বিক প্রতীতির মূলের মৃত্তিকা একান্তই দেশজ বাস্তব মাটি। কিন্তু এর ফুল ব্যক্তি-মুক্তির মন্ময় সিদ্ধান্তের অসংগতিতে জীবন্ত কিন্তু বিচিত্র। সে অসংগতি থেকে মুক্ত তাঁর উপন্যাসের নায়কবন্ধুরা। বড়ো ভাবনা উপস্থাপিত করেছে তাঁর বড়ো মাপের নায়কেরা। কিন্তু দুরূহ কর্তব্যভার অবলীলায় কাঁধে তুলে নিয়েছে বিনয় অথবা শ্রীবিলাস—বিহারীর কথাও পৃথকভাবে এখানে স্মর্তব্য। প্রসঙ্গত গোরা এবং শচীশ আর অন্য পক্ষে বিনয় এবং শ্রীবিলাসের প্রতিতুলনাও জরুরি হয়ে পড়ে। চরঘোষপুরে ভারতীয় গ্রামে শ্রেণী, বর্ণ, ক্ষমতার নবীভূত ঐক্যরূপ দেখে তীব্র হয়ে উঠেছে গোরার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। সে বুঝেছিল এখনই কিছু একটা করা দরকার। ক্রোধের সঙ্গে বিস্ফোরণের অনিবার্য সম্পর্কের ফলে গোরাকে কারাবরণ করতে হল। শচীশের কোনো প্রান্তের অভিজ্ঞতাতেই প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতার এমন ঝোড়ো ঝাপট লাগেনি। সে কেবলই একটা ছক থেকে আর একটা ছকে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'চতুরঙ্গ'-এর চার অংশের তিনটিতে প্রধান কথা শচীশ। স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনটি অংশের বিবৃত সমাপ্তি বা open ending যেন একথাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে শচীশের সত্যান্বেষা শেষ পর্যন্ত একটা অসমাপ্ত ব্যাপার। বিনয় এবং শ্রীবিলাসের পার্থক্যটিও বাঙালি মধ্যবিত্তের দুই অধ্যায়ের নিদর্শন। বিনয় ললিতার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শ্রীবিলাস নিজেই তার জীবনে শচীশ-দামিনী ঘটিত জটিলতাকে জড়িয়ে নিয়েছিল। 'চতুরঙ্গ'-এর লিখনশৈলী থেকেই স্পষ্ট যে শ্রীবিলাস সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার পর তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে বসেছে। তার

দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই জন্য এসেছে একটা নিরাসক্ত কৌতুকবোধ। যা সরাসরি বর্ণনা করলে নাটকীয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল শ্রীবিলাস তাকে বিনয়ে অ্যাভারেজ ঘটনা বলে প্রতীয়মান করাতে চেয়েছে। তাতে ঘটনা বা চরিত্র কেউই অ্যাভারেজ হয়ে যায়নি, কেবল শ্রীবিলাসের দায়িত্ব-জ্ঞান যে কত অসাধারণ তা বিনয় সত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি উন্মোচিত স্তরে শচীশের গল্প। কিন্তু নিহিত স্তরে এ তো শ্রীবিলাসের গল্প। এ তো একান্ত শ্রীবিলাসেরই অভিজ্ঞতা। বাঙালি মধ্যবিত্তের উনবিংশ শতকীয় ঈপ্সিত নৈতিক সামাজিক বিপ্লব যে এক লহমায় ঘটিয়ে দেয়—"যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে—দামিনী ঠিক কথাটি বলেছিল, "তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।" বস্তুত শ্রীবিলাসের মধ্যেই আমরা তার সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা ত্রিমাত্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করেছি। সে তত্ত্বমাত্র নয়, আবার গোরার মহিমের মতো বস্তুমাত্রও নয়। সে সেই সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে নিজেকে গড়ে তুলেছিল একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তারূপে। তার নিজেকে নিয়ে পরিহাসের পিছনে ছিল নিজেকে শনাক্ত করার আশ্চর্য ক্ষমতা। তার সেই আত্ম-জ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে তার অভিনিবিষ্ট বাস্তব-অধ্যয়নের ফল। শচীশকে সে বুঝে-ছিল মনন দিয়ে, দামিনীকে সে বুঝেছিল হৃদয় দিয়ে। স্থিরবুদ্ধি শ্রীবিলাসের বিচার-বিভ্রাট ঘটেনি বলেই সে অসীমাভিসারী তত্ত্বকে প্রণতি জানিয়ে আপন পক্ষপাত সুনির্দিষ্ট করেছে জীবনের প্রতি। তার কাছে সেই জীবনেরই অপর নাম দামিনী।

এবারে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রের দুই ধারার দিকে মনোনিবেশ করব। এর একটি ধারায় রয়েছে হেমনলিনী, সুচরিতা, কুমু। আরেক ধারায় রয়েছে বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা, এলা। হেমনলিনী, সুচরিতা এবং কুমু শান্ত, অন্তরের বিশুদ্ধতার সৌরভে স্নিগ্ধ—বস্তুজগৎ তাদের পীড়ন করতে চাইলেও তাদের আলোর আভাকে কখনও মলিন করতে পারে না। পক্ষান্তরে রূঢ় কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঘাতে প্রতিঘাতে যাদের ব্যক্তিত্বের নতুন মাত্রা অর্জিত হয়েছে তারা হল বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা, এলা। এই চারজন নারীর চারটি শেষ উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিনোদিনীর শেষতম উচ্চারিত উক্তি "আমার আর কিছু দরকার নাই।" দামিনী বলেছিল "সাধ মিটিল না; জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।" বিমলা ভেবেছিল "আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্য।" আর এলা বলেছিল, "শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্ত।" বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যসের মধ্যে নায়কান্ত পরিসমাপ্তির

উপন্যাসই বেশি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে নায়কান্ত পরিসমাপ্তির উপন্যাস মাত্র 'নৌকাডুবি' আর 'গোরা'। আমাদের উদ্ধৃত সমস্ত উপন্যাসগুলিই নায়িকান্ত পরিসমাপ্তির উপন্যাস। এইসব উপন্যাসে প্রত্যেকটি নারী-ব্যক্তিত্ব নিজেদের হাতে জ্বালিয়ে-তোলা আগুনের আলোয় নিজেদের স্বরূপ খুঁজতে চেয়েছে। পাশে পাশে একথাটি যদি আমরা মনে রাখি যে, তাঁর প্রতিটি প্রধান নাটকের সমাপ্তি নায়কান্ত, তাহলে আর একটা কথাও স্পষ্ট হয়। তাঁর প্রধান নাটকের নায়করা কেউ প্রত্যক্ষ সমসাময়িক জগতের ব্যক্তিপাত্র নয়। প্রহসন বা কৌতুক নাটকের বাইরে 'বাঁশরী' (১৯৩০) তাঁর একমাত্র প্রধান নাটক যার বিষয় প্রত্যক্ষ সমসাময়িক জগৎ থেকে আহৃত। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করি সে নাটকটিতে নায়িকান্ত সমাপ্তি ঘটেছে—অন্তত যথাসম্ভব নায়িকান্ত। ব্যক্তিচরিত্রের ট্রাজেডি পরিকল্পনায় জাতকীয়, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বাতাবরণে পুরুষ চরিত্রের উপর ঝোঁক পড়েছে বেশি। তাঁর উপন্যাসে সে জাতীয় ট্রাজেডি পরিকল্পনা নেই। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে 'চোখের বালি' থেকেই ভিতরে ভিতরে আরিস্তোতলীয় কাঠামো ভাঙতে শুরু করেছে। 'চতুরঙ্গ'-তে সে ভাঙন সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভাঙনটা আবশ্যিক হয়েছে তাঁর নায়িকামুখ্য কথাকাহিনীর অন্তর্গূঢ় সংঘাত-সংকুল নাটকের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নায়িকা একথা প্রমাণ করেছে যে, জীবনে অন্বেষার চরিত্র কত বিচিত্র। সেজন্যই বিমলা-চরিত্র প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য ছকে বাঁধা প্রথাগত ভাষ্য নয়।

বিনোদিনীর নিজ নিয়তিকে খণ্ডিত করার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা, দামিনীর প্রতিহত জিজীবিষা, বিমলার নৈতিক উদ্বেগ, এলার আদর্শগত কমিটমেণ্ট ও নিজ অস্তিত্বের নিগূঢ়তম অভিজ্ঞতার মধ্যে মীমাংসাহীন সংঘর্ষ—রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতাবোধের গভীরতা নির্দেশক এক একটি স্তর। যে বাস্তবতা বোধের অপর নাম বৌদ্ধিক সচেতনতা, এবং যে বৌদ্ধিক সচেতনতার মূল লক্ষ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর জের সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়ে বিংশ শতকীয় মাত্রার চরিত্রগুলির গোড়া-পত্তন তার দেখা মেলে বিনোদিনী-দামিনী-বিমলা-এলা পরিকল্পনায়। পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলির উপর এ ব্যাপারে প্রাধান্য আরোপ, তথা এমফ্যাসিসের একটা কারণ অনুমেয়। ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজে নারীর ট্রাজিক ব্যক্তিক উদ্ভাসন তুলনামূলকভাবে অধিক। এ সমাজের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিতে উদ্দীপিত হয়েছে তারা, এ সমাজের প্রদত্ত প্রথম আশ্বাসের আহ্বানে চঞ্চল হয়ে সাড়া দিয়েছিল তারা। সে সাড়া কোনো তত্ত্ব বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আহ্বানের সাড়া নয়। তারা বিশ্বাস করেছিল জীবনের অমেয় সম্ভাবনায়; আত্মপ্রকাশের ও

স্ফুরণের অবকাশে। তাই প্রতিহত এবং পর্যুদস্ত তারাই সব থেকে ভালো করে এ কথাটা বুঝিয়ে দিল, রিয়ালিটিকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা না থাকলে সব স্বাতন্ত্র্যের সাধ বা স্বাধীনতার পিপাসাই বৃথা।

আরো একটা কথা—এবং এ প্রসঙ্গে বোধহয় সবচেয়ে জরুরি—এই সব নারী চরিত্র কল্পনার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে ব্যক্তির আপন শুদ্ধস্বরূপ সন্ধানের ব্যাপারে বাধাটা শুধু সামাজিক বা পারিবারিক নয়। সত্তার পরিপূর্ণ উন্মীলনের পথে তাকে অনেক কিছুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ তার নিজের মধ্যেই। নিজেকে ভেঙে গড়ার মধ্যে, গড়ে ভাঙার মধ্যে। বিনোদিনীতে এ-পরিকল্পনার শুরু, এলাতে এর পরীক্ষার সমাপ্তি। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের যুবকবেলার অন্যতম দান ব্যক্তির অশেষত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়। সেই প্রত্যয় এই সব নারী চরিত্রের ভিত্তিগত উপাদান।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'যোগাযোগ' লিখলেন তখনও 'রক্তকরবী'র ভাববলয়ের ছায়া যে মিলিয়ে যায়নি তা বোঝা যায়। 'যোগাযোগ'-এও আছে এক ধনতৃষ্ণ ক্ষমতা-লোভী শক্তি-অভিমানী পুরুষ, যে সকলকে অন্ধকারে রেখে দেয়, মানে না কারো স্বাতন্ত্র্য। অথচ ভিতরে ভিতরে সে দুর্বল ব্যক্তি। আর তার সন্নিহিত বিপরীতে রয়েছে এক অপরাজেয় নারী সত্তা, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা যার প্রধান শক্তি। কিন্তু 'যেগোযোগ' তো প্রতীকে পরমা কবিতা নয়—সে উপন্যাস। বস্তুজগতের দৌরাত্ম্যকে সেখানে বস্তুজগতের মতোই প্রতীয়মান করাতে হবে—শুধু শিল্পের তাগিদেই নয়, জীবনের তাগিদেও বটে। তাই 'যোগাযোগ' রূপকের ফ্রেমে সব কথা বলতে পারে না। নির্বস্তুক নারীত্ব নয়, এর বিষয়-বস্তু রক্তমাংসে গড়া এক নারী—কলকাতার ধোঁয়া যেমন নীল আকাশের শ্বাসরোধ করতে চায়, সেই নারীর শুদ্ধ সত্তাকেও তেমনি চেপে ধরতে কম্‌প্রাদুর মধুসূদনের পঙ্কপিচ্ছিল মালিকী অভিপ্রায়। সেই নারীর দেহাধীন নিয়তিও ঐ স্থূল বস্তবতারই অংশ। কিন্তু একথা আজ আমাদের জানার উপায় নেই সেই নারী তার নিয়তিকে শেষপর্যন্ত কীভাবে উপেক্ষা করেছিল। কারণ আমরা জানি এ উপন্যাসের প্রাথমিক পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পূর্ণ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সব নায়িকাই—এক লাবণ্য ছাড়া—এক অন্তর্গূঢ় নাটকের নায়িকা। কিন্তু প্রথাসিদ্ধ মঞ্চ রূপায়নে সে নাটককে মূর্তি দেওয়া যায় না। যায় না যে তার বড়ো প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথেরই নিজের হাতে 'মালঞ্চে'র নাট্যাকৃতি। নাটকটি পড়লেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন সেই সব দর্শকদের উদ্দেশ্যেই লিখেছেন

যাঁরা উপন্যাসটি পড়ে এসেছেন। উপন্যাস-নিরপেক্ষভাবে নাটকটি ভাবাতিরেক-বিহ্বল। উপন্যাসের যে ছোট ছোট পরিচ্ছেদগুলি, যেমন সপ্তম বা অষ্টম পরিচ্ছেদ, বা দীর্ঘ সংলাপগুলি যদিই বা উপন্যাসসাপেক্ষ নাটকীয়তায় আতত ছিল, তা যে উপযুক্ত অবজেকৃটিভ কোরিলেটিভ বা বাস্তব অবলম্বন পাচ্ছে না, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সজাগ ছিলেন। নাটকীয় প্রত্যক্ষতায় শ্রুতি ও দৃশ্যের সহযোগে তাকে বাঁচাতে পারবেন ভেবেই এই নাট্যরূপায়ণ। আমরা মনে রাখি অসুস্থ প্রায় মুমূর্ষু নায়ক বা নায়িকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ডাকঘর' (১৯১২), লিখেছেন 'শেষের রাত্রি' (১৯১৪), লিখলেন 'মালঞ্চ' (১৯৩৩)। এরমধ্যে 'ডাকঘর' ছাড়া আর দুটি কাহিনীতেই ভাবপ্রবণ পরিস্থিতি পরিবেশের অবকাশ ছিল বেশি। 'ডাকঘর'-এ যে তা ছিল না তার কারণ এই যে, ব্যাধিবন্দী অমলের ক্ষেত্রে যন্ত্রণাটা ছিল জগদ্বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। 'শেষের রাত্রি' বা 'মালঞ্চ'-এ নায়ক বা নায়িকার যন্ত্রণাটা কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাকুলতা কিছুটা সেন্টিমেন্টাল হতে বাধ্য। তবু রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ'-কে তাৎপর্যের দিক থেকে একটা নতুন মাত্রা দিতে পেরেছেন, সেই ব্যাখ্যাটি আমরা যেন 'গৃহিণীপ্রেয়সী' প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে ম্লান করে না ফেলি। নীরজার পরাজয় সরলার কাছে নয়—ব্যাধির কাছেও নয়। যে শয্যাগত হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু তা না হয়ে যদি গৃহগত হয়েই থাকত, তাহলেও তার পরাজয়ই ঘটত। এই পরাজয়ের কারণ সরলা তথা নতুন কাল। নীরজা প্রথমাংশের বিমলার মতোই আদিত্যের ছায়া হয়ে গিয়েছিল। সরলা কারও ছায়া নয়। সে নিজেই এক ছায়াবহ, পুষ্পবহ, নিজ ব্যক্তিগতভূমিকা-সচেতন তরু। উপন্যাসের মধ্যে সবথেকে চলিষ্ণু চরিত্র সরলা। তার কর্মিষ্ঠ ব্যাপক ভূমিকা নীরজার থেকে অনেক বেশি স্তর ও মাত্রাবিশিষ্ট। এইখানেই নীরজার ব্যর্থতা—নীরজার সৃষ্টিকর্তারও ব্যর্থতা যে, সরলার সঙ্গে নীরজা ঠিক সমতলে দাঁড়িয়ে যুঝে উঠতে পারল না। নীরজা তার সমস্ত সততা সত্ত্বেও ইতিহাসের পেছনের পাতার মানুষ। আদিত্য-নিরপেক্ষভাবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সরলা ইতিহাসের সামনের পাতার মানুষ। সে কারও প্রদত্ত পরিচয়লিপি বহন করে না। আমরা নীরজার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারি, কিন্তু উপন্যাসে যখনই সরলা কথা বলেছে তখনই আমাদের বৌদ্ধিক কৌতূহল অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। এইখানেই নীরজার হার। সে হার এক ঐতিহাসিক ভবিতব্যতার দ্বারা নির্দিষ্ট।

সংলাপে ভরা উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। এবং 'চার অধ্যায়'-এর নাট্য-সম্ভাবনা

যে প্রথম থেকেই লেখকের মনে স্পষ্টত সজাগ ছিল তা বোঝা যায় প্রত্যেকটি প্রধান অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদগুলির মঞ্চসজ্জানির্দেশকল্প দৃশ্যবর্ণনা থেকে। 'চার অধ্যায়'কে তাঁর আলাদা করে নাট্যরূপ দেবার দরকার হয়নি। উত্তরকালের যোগ্য নাট্যসম্প্রদায় 'চার-অধ্যায়'-এর লেখক-অভিপ্রেত গূঢ়ার্থ মান্য করেই সে কাজ করেছেন। 'মালঞ্চ'-এর মধ্যে সে জাতীয় কোনো নাট্যদ্বন্দ্ব তথা ঔপন্যাসিক অভিপ্রায়ও সংঘাতস্পন্দিত হয়ে ওঠেনি। খণ্ডোপন্যাস বলে নয়, খণ্ডিত নাটক বলেও নয়—জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশে ঘাতে প্রতিঘাতে ফেনিল হয়ে ওঠেনি বলেই এমনটা ঘটেছে। এবারে আমরা এ আলোচনার উপান্তে পৌঁছে নিশ্চয় একবার অন্তত স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসতত্ত্বের মূলকথা। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে 'সাহিত্যের গৌরব' (শ্রাবণ ১৩০১) প্রবন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। হাঙ্গেরী লেখক য়োকাইয়ের লেখা 'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' উপন্যাসটি আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সেই ১৮৯৪ সালেই। তখনও তিনি 'চোখের বালি' লেখেননি। তখনও তিনি 'মেঘ ও রৌদ্র' লেখেননি। য়োকাই ও আধুনিক পোলিশ সাহিত্যের পথিকৃৎ ক্রাসজিউস্কির 'ইহুদি' উপন্যাস দুটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন। তার প্রথম কথা হল—লেখকের সঙ্গে স্বদেশের নিবিড় যোগ থাকা আবশ্যিক। দ্বিতীয় কথা হল—মানুষ কেবল মানুষ বলেই মনোযোগের বিষয় হবে। য়োকাইয়ের উপন্যাসের নায়িকা শাস্ত্রসম্মত চরিত্র নয়। কিন্তু তার 'নারী-প্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান'। তৃতীয় কথাটি হল—একজন ঔপন্যাসিকের যথার্থ প্রতিভা 'জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলনদোলায় লালিত' হয়। কিন্তু আমাদের এই প্রসঙ্গের অবতারণার অর্থ এই নয় যে, 'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' অথবা 'ইহুদি' উপন্যাস দুটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিচার ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তার মীমাংসা করা। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার ভিতর থেকে উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর সঠিক মনোভাবটি অনুধাবন করতে পারি। এই রচনাটি লেখবার প্রায় কুড়ি বছর পরে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'-র বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছিলেন—"কবির কাব্যে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে।" (বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলী / অষ্টম খণ্ড / ৫২৩ পৃষ্ঠা)।

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস সংক্রান্ত আদর্শকে প্রথম থেকে শেষ অবধি লালন করেছেন। আমরা আমাদের বর্তমান নিবন্ধে বারবার দেখিয়েছি

যে, এই ব্যাখ্যাসূত্রটি বাদ দিলে রবীন্দ্র-উপন্যাসকে সঠিক প্রেক্ষিতে ধারণ করা যায় না। লুকাচের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ সমালোচক য়ুরোপীয় বস্তুবাদের শ্রেষ্ঠ উদ্‌ঘাটক হয়েও যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করেছিলেন, তার কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও বিশ্ববাস্তবতা অধ্যয়নের মূলসূত্র ধরতেই পারেননি। Tagore's Gandhi Novel : Review of Rabindranath Tagore (1927) প্রবন্ধে লুকাচ যখন 'ঘরে বাইরে' প্রসঙ্গে বলেন, 'The intellectual conflict in the novel is concerned with the question of the use of violence'. তখন আমরা বুঝতে পারি লুকাচ নিখিলেশ এবং সন্দীপকে সামনে এনে উপন্যাসের আসল অগ্নিকেন্দ্র বিমলাকে ভুলে গিয়েছেন। অথচ দেশ কাল পাত্রের সম্মিলিত অগ্নিদহনের কেন্দ্রবস্তু তো বিমলা! তার প্রশ্নটা হিংসা বা অহিংসার নয়—তার প্রশ্নটা হল নবীন ভারতবর্ষের আত্মসন্বিত অর্জনের প্রশ্ন। অহিংসার ধুয়ো সেখানে তখন কোথায়?

পাঁচ

১৯১৯ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেল। জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রমাণ করল শাসক শ্রেণী কতদূর নামতে পারে, প্রথম অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার সৃষ্টি করল একটা নৈরাশ্য, চরমপন্থীরা মরিয়া হয়ে উঠল, শ্রমিক অসন্তোষ মূর্তি ধারণ করল নানা স্তরে—রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবেশ ঘটল। এসটাবলিসমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা তখন সমাজে রাজনীতিতে প্রবল। সুতরাং শিল্পে যে সেই চ্যালেঞ্জের ব্যত্যয় হবে না এ তো স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে বাইরে' লিখলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ' থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্য দুভাগে ভাগ হলো। রবীন্দ্রনাথই সে বিভাজন সম্ভব করে তুললেন। একভাগে থাকল বিশুদ্ধ শিল্প লক্ষ্য উপন্যাস। সেই ভাগেই থাকল নিরাসক্তি, কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। 'চতুরঙ্গ'-এর গল্পাকার বিবৃতি অসম্ভব, 'ঘরে বাইরে'র যদিবা সম্ভব। এমনই 'চতুরঙ্গ'-এর শৈল্পিক প্রকৃতি। যে বছর রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছে সে বছরই প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া'। আমরা যে দুই ভাগের কথা বলছি 'অরক্ষণীয়া' পড়ে সেই ভাগের দ্বিতীয় ভাগে। ওখানে ছিল স্বতন্ত্র শিল্প শুদ্ধতার চর্চা, এখানে অগ্রাধিকার পেল হৃদয়াবেগ। ওখানে নিরাসক্ত হবার সংকল্প। এখানে বিজড়িত

হবার বাসনা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস জগৎ বুদ্ধিমনন চিন্তনের জগৎ। তাই মন্দীভূত মুহূর্তে তা নীরক্ত ও পাংশু বলে অভিযুক্ত হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস জগৎ জীবন যেমন তারই ছায়াবহ। শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় বলা হয় 'অকৃত্রিম বিষয়জ্ঞানের কথা', 'বাস্তব বাতাবরণের কথা', 'যথাদৃষ্টকে প্রতিফলিত করতে পারার কথা'। পক্ষান্তরে শিল্পপ্রাণ উপন্যাসের মূল লক্ষ্য হলো 'নৈর্ব্যক্তিকতা', 'অনাসক্তি', 'কাব্যোপম বিশুদ্ধতা' ও আঙ্গিকরীতির বিশুদ্ধতা। বাঙালি মধ্যবিত্তের যে আত্মসমীক্ষা এবং স্বাভিজ্ঞান সংকটের প্রশ্নকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন বারে বারে, শরৎচন্দ্রের উত্থাপিত প্রশ্নটা ছিল তা থেকে আলাদা। বস্তুত প্রশ্নটা তথা ব্যাধির সমগ্রতাকে বুঝে নেওয়া অপেক্ষা তিনি আমাদের দিয়ে 'আহা' বলিয়ে নিতে পারলে বেশি সুখী হতেন। এখানেই তাঁর ইনভল্‌ভ্‌মেণ্ট। যে সময়টা তাঁকে তাড়িত করেছে সেই সময়ের নিজস্ব আক্ষেপ বা টেনশনও এই সূত্রে অনুধাবনীয়। শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালি তার বিপন্নতা থেকে বিশেষ-ভাবে প্রাণিত হয়েছে তার অন্তরের ধনকে বুকে টেনে নিতে। যে আবেগে পথে নেমে পড়া বাঙালি সেদিন বলতে চেয়েছিল বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন সব এক হোক, সে আবেগ অকৃত্রিম এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় তা তাৎপর্যপূর্ণ। এই আবেগের আলোয় চিনে নেওয়া যায় সেদিনের বাঙালির মনোভূমিকে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে দ্বিভাজনকে বাঙালি সেদিন প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল, সেই বাঙালির মৌল আবেগ সেদিন কোনো ক্ষেত্রেই দ্বিভাজনকে প্রশ্রয় দিতে চাইবে না—এটাই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্রের হাতে বিপন্ন যৌথ সংসার ভাঙতে ভাঙতেও ভাঙল না—এ চিত্র কয়েকবার দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই ইতিহাসের পটে স্থাপিত বাঙালির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সেদিন ছিল একটা বড় জয়ের তৃপ্তি—সেদিনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সে রুখে দিয়েছে। শরৎচন্দ্র এই বাতাবরণে যেদিন লিখলেন রামের সুমতি বা বিন্দুর ছেলে বা নিষ্কৃতি, সেদিন এইসব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলি ধৃতিরূপিণী বঙ্গজননীর আর্কেটাইপের স্মারক। এই আর্কেটাইপটি শরৎচন্দ্র কোনোদিন পরিত্যাগ করতে পারেননি। এমন কি প্রেমিকা চরিত্র অঙ্কনের বেলাতেও সে আর্কেটাইপ কার্যকর থেকেছে। আশ্চর্য যেখানে শরৎচন্দ্র এই আর্কেটাইপ পরিহার করে নায়িকা চরিত্র আঁকতে গিয়েছেন—যেমন অচলা, কমল, বন্দনা সেখানেই তিনি ব্যক্তিপ্রতিমা অঙ্কনে নানা অসংগতি সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম কিরণময়ী। অসংগতি সত্ত্বেও জীবন্ত সমগ্রতায় কিরণময়ী অনন্যা। তার সমস্ত ভ্রষ্টতার মধ্যে তার যন্ত্রণার দীপ্তি কখনো দুর্লক্ষ্য নয়। তার কোনো

আচরণের কোনো কৈফিয়ত সে যেন কারো কাছে দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু দিবাকর প্রসঙ্গে সে যেন বুঝিয়ে দিয়ে গেল সে শুধু সর্বনাশিনী নয়, আত্মনাশা হয়ে ওঠাই তার ভবিতব্য। 'শেষ প্রশ্নে' কমল বৌদ্ধিক জগতের অধিবাসিনী হতে গিয়ে ব্যর্থ। কিরণময়ীর সঙ্গে বৌদ্ধিকতার কোনো সম্পর্ক ছিল না এমন নয়—কিন্তু যে ব্যর্থতায় সে জ্বলে উঠেছে তা তার নারীত্বের ব্যর্থতা। সেই দহনে সে জীবন্ত।

শরৎচন্দ্র আমাদের প্রধান ঔপন্যাসিক এজন্য যে গ্রামবাংলার ত্রিস্তর এলিটীয় সংঘাতকে তিনি প্রথম সঠিক অনুধাবন করেছিলেন। বর্ণীয় এলিট মহিমা ছিল না বলেই শিক্ষাগত এলিট মর্যাদা অভিপ্রায়ী বৃন্দাবন ('পণ্ডিত মশাই') গ্রামীণ বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি—অন্তত প্রাথমিক সংগ্রামে সে প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বিষয়টিকে আরো গভীরে নিয়ে যান। বর্ণীয় মহিমা এবং ব্যবসায়ী চারিত্র সেখানে কেমনভাবে একীভূত হয়ে সমাজে নতুন প্রতিকূলতার জন্ম দিয়েছে। অবশ্য এখানেও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মেলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চেতনাবলয়ের বিস্তৃতির ইতিহাসটি লক্ষণীয়। চরঘোষপুরে গোরা দেখেছিল বর্ণীয় অভিমান, শ্রেণীগত আধিপত্য ও শাসক শ্রেণীর মদত কীভাবে একাসনে অধিষ্ঠিত থাকে। ব্রাহ্মণ নায়েব এবং ইংরাজের দারোগা পুলিশ কেমন পরস্পর মুখাপেক্ষী চরঘোষপুরের ঘটনা তার প্রমাণ। উপবীত গঙ্গামৃত্তিকা সচেতন গোরার কিন্তু এই সমাজপট অধ্যয়নে কোনো ভুল হয়নি। সে গণসংগ্রামের স্মৃতিধন্য নাপিতের ঘরেই নিজের যন্ত্রণাময় সম্বিতের সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রে এই জাতীয় যন্ত্রণার অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রমেশ পল্লীসমাজকে চিনত না বটে—নিজেকেই সে কি চিনত? বিশ্বেশ্বরী তাকে চিনিয়ে দিলে সে পল্লীসমাজকে জানে—রমাকেও বুঝি চিনতে হয় বিশ্বেশ্বরীর হাত ধরেই! তাঁর পুরুষাকার পরিকল্পনার এই অসংগতির জন্য তাঁর একটি অতীব সম্ভাবনাময় উপন্যাস নষ্ট হয়ে যায়। উপন্যাসটি 'পথের দাবী'। কেন ব্রহ্মদেশ এই উপন্যাসের পটভূমি, তার উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা ঔপন্যাসিকের চরিত্রপাত্র পরিকল্পনার নানা অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করি। অনেক কৈফিয়তের দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যই এই প্রবাসপটের আয়োজন। একথা 'পথের দাবী'-র মতো বিস্ফোরক উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য, রোমান্সের পরমহংস অমিতের জন্য কল্পিত শিলঙের পটভূমি সম্বন্ধেও সত্য। এবং এই প্রসঙ্গেই বলা চলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান পুরুষদের আচরণ বড় দ্বিধাগ্রস্ত। অনেকাংশে তারা সকলেই হয় রমেশ নয় বৃন্দাবন। অন্যথায় তারা

ভঙ্গিসর্বস্ব—হয় সব্যসাচী, নয় বিপ্রদাস। ব্যতিক্রম বোধ করি জীবানন্দ। ষোড়শী নাটকের জীবানন্দ নয়, দেনাপাওনা উপন্যাসের জীবানন্দ। পক্ষান্তরে তাঁর নারী চরিত্রেরা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রের মতো ব্যক্তিত্বের বিভায় দীপ্তিময়ী না হলেও আত্মদহনের স্বাতন্ত্র্যে তারা অবিস্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী শৈবলিনী থেকে শুরু করে ইন্দিরা রাধারাণী সকলেই জিজীবিষায় অকুতোসংকোচ। রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র কল্পনায় বারে বারে প্রাধান্য পেয়েছে নারীর উপলব্ধির সংকট। এ উপলব্ধির গোড়ার কথা হলো জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তার সঠিক সম্পর্ক খুঁজে নেওয়া। খুঁজে নেবার পথে যে বাধা—যে বাধা ভিতরে এবং বাইরে, তার সঙ্গে সংঘাতের আগুনে সে নারী জ্বলে ওঠে। শরৎচন্দ্রের ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা। এবং আলাদা বলেই তিনি এত জনপ্রিয়। পুরুষ প্রধান সমাজে উদার পৌরুষের অহমিকাকে শরৎচন্দ্র ঠিক ঠিক তুষ্ট করতে পারেন নারীর বিপন্নতার ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করে। ভালোবাসা নারীর অস্তিত্বের সমগ্রে ক্রিয়াশীল। তার যে বিপন্নতা তা সেই ভালোবাসার কারণে। এইসব অসহায় (রাজলক্ষ্মী, রমা, সাবিত্রী) এবং বিমূঢ় (অচলা, জ্ঞানদা) নারীর জন্য 'আহা' বলবে না, বুর্জোয়া উদারতায় শিক্ষাভিমানী এমন যুবক নেই। লক্ষণীয় যে বিপন্নতার কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু ভালোবাসার বিপন্নতা নয়। ভালোবাসার কারণে নারীর বিপন্নতা। সেই বিপন্নতার দামে আমরা এবং সেই নারী ও তার ভালোবাসার দাম কষেছি। যে নারী আমাদের এই বর্ণিত ছককে ভেঙে গুড়িয়ে দেয় সে কিন্তু কমল নয়, কিরণময়ী নয়, অভয়াও নয়—সে অন্নদা। সে একটা কথা আমাদের জানিয়ে গেল। সে তার অসম্মানিত ভালোবাসাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হতে দেয়নি। তাকে সে এক মুহূর্তের জন্য অস্বীকার করেনি। এটা যে শুধু তার সতী ধর্মের হিন্দু সংস্কার মাত্র নয়, তার প্রমাণ রয়েছে মৃত শাহজীর বিষনীল ওষ্ঠাধরে অন্নদার শেষ চুম্বন এঁকে দেওয়ায়। এই একটি চুম্বন অন্নদার সমস্ত আচরণকে নীতি অনীতির বাইরে নিয়ে গেছে। যেসব প্রশ্ন আমরা আজকের প্রেক্ষাপটে তাকে করতে পারি, সেসব প্রশ্নকে সে ম্লান করে দিয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন প্রথম মহাযুদ্ধের কামানের ধোঁয়া দিগন্ত থেকে মিলিয়ে যায়নি। মধ্যবিত্তের পতন তখন শুরু হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী মন্দা তখন শনৈ এগিয়ে আসছে। এই দশকে যে দুজন বাঙালি উপন্যাস চরিত্রকে আমরা সময়ের প্রতিনিধি বলে মনে করতে পারি, তারা সর্বতোভাবে অমূলতরু। একজন শ্রীকান্ত, আর একজন অমিত। কারো কোথাও

শিকড় নেই। শ্রীকান্তকে বলতে হয়েছে সে ভবঘুরে। অমিত প্রাণপণে—পোশাকে পরিচ্ছদে, জীবনযাত্রায় বোহিমিয়ানিজ্‌মকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল। তার প্রতিবাদ ফ্যাশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দুই নায়কের মধ্যে একটা আপাতমিল লক্ষণীয়। দুজনের কেউই খাঁটি বঙ্গীয় সমাজপটে সংলগ্ন নয়। যে পর্বে শ্রীকান্তকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজপটে লগ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেও সে কোনো নিয়ামক শক্তি নয়। সে আরোপিত। দুটি নায়কই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি মধ্যবিত্তের পতনের যুগের নায়ক। শ্রীকান্তের সমস্ত স্বগতোক্তি এবং অমিতের সকল কবিতা নিহিতার্থে লুকিয়ে রেখেছে একটা ব্যর্থতাবোধ। যাকে তারা একাকীত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বলে মনে করছে তা আসলে তাদের শূন্যতা। ততদিনে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে 'কল্লোল' (১৯২৩) দেখা দিয়েছে 'কালিকলম' (১৯২৬), সংকটাপন্ন মধ্যবিত্তের মুখপত্র হিসাবে দেখা দিল। 'কল্লোল' তার সম্পাদকীয় সমর্থনে মধ্যবিত্তের দুর্দশার দিকে অঙ্গুলীসংকেত করেছে বেশি করে। ওদিকে ইতিহাস তখন দ্রুতচ্ছন্দ। ১৯১৯ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে যে ক্যালিডোস্কোপ তার পরিচয়ে রয়েছে বাদী প্রতিবাদী নানা বর্ণচ্ছটার সমাবেশ। জালিয়ানওয়ালাবাগের সাম্রাজ্যবাদী জান্তবতা, প্রথম অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধীজির আন্দোলন গুটিয়ে নেবার ফলে মধ্যবিত্তের হতাশা, শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী সরবতা, জাতীয় ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবেশ—সেদিনের দ্বন্দ্বময় বাস্তবের নানা উপাদান। 'কল্লোল' এই সময়ের যথার্থ প্রতিনিধি কিনা, তা কতখানি কোলাহল, কতখানি বাণী, এ প্রশ্নের মীমাংসাক্ষেত্র এই লেখাটি হতে পারে না। কিন্তু একটা কথা বলা যায়। এই সময়ের অনিবার্য নির্দেশ ছিল যুবশক্তিকে বিদ্রোহের জন্য ডাক দিতে হবে। 'কল্লোল' প্রজন্মগত ব্যবধানকে প্রথম সংঘবদ্ধ স্বীকৃতি দিল। ড. রবিন পাল তাঁর 'কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

> 'দেশের ও সমাজের অবস্থা তরুণের দলকে জর্জরিত করিতেছে, (যাঁহাদের মুখ চাহিয়া তাহারা এ যন্ত্রণা ভুলিতে পারে) তাঁহাদের মুখেও কোন উচ্চ আদর্শের জ্যোতি দেখিতে পায় না, আজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই তাহারা এই নিষ্ঠুর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে যদি গুরুজনদের মনকষ্ট হয়, বা কাহারও কাহারও অপযশও হয় তাহাও তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত।'

মনস্বী গবেষক এই অংশে তৎকালীন সাহিত্যিক বিদ্রোহের তাৎপর্য খুঁজেছেন। তিনি তা পেয়েছেন বটেই। কিন্তু আমার 'কল্লোল' পাঠ আমাকে আরেকটু কিছু

বলে। এই সাহিত্যিক বিদ্রোহ মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথের সগোত্র নয়। কল্লোলের বিদ্রোহ অনেকটাই সামাজিক প্রতিবাদ। 'পাঁক' 'পটল ডাঙ্গার পাঁচালী'-কে অথবা শৈলজানন্দের প্রয়াসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে তা নইলে ধরা যাবে না। অচিন্ত্যকুমার বা বুদ্ধদেব বসুকে দিয়ে কল্লোলের যৌবনরাগকে চেনা যায়। সে চেনার গৌরবকে গৌণ করা কারও সাধ্য নয়। কিন্তু কল্লোলের জীবন-রাগকে বুঝতে হবে আরো বড়ো প্রেক্ষাপটে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা মিত পরিসরে যুবনাশ্ব বা আঞ্চলিক পট পরিবেশে শৈলজানন্দ যে আলোয় জীবনকে ধরে নিতে চেয়েছেন, তা দূর য়ুরোপের গোর্কি বা হামসুনের জীবনবাদের মিশ্রণ নয়। তাঁরা সেদিনের দেশজ হাওয়াতেই ডালপালা মেলতে চেয়েছেন—শিকড় মেলতে চেয়েছেন দেশের মাটিতেই। বিশ্বজোড়া মন্দার যুগে বাঙালি যুবকদের একটা খণ্ডচিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন 'মিছিল'-এ। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হবার পরে লক্ষ্যহারা যুবকমণ্ডলীর এমন চিত্র আর কোথাও মিলবে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভা ছোট গল্পে সোনা ফলিয়ে বড় উপন্যাসে মনোযোগ দিতে সময় পায়নি। হয়তো তাঁর প্রতিভা বড় উপন্যাসের অনুকূল ছিল না। কিন্তু তিনি যে দু একটা উপন্যাস লিখেছেন তাতে তাঁর দেশকালপাত্রের বোধ অব্যর্থ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। দেশজ প্রাণস্রোত দেশের মানুষের লোকায়ত বাকশৈলীতে মূর্তি ধরে। আঞ্চলিক ভাষা যে শুধু হাস্যরসের বাহনই নয়, তা যে চরিত্রপাত্রের অন্তরের ভাষাও হতে পারে সে কথা এই যুগেই প্রথম প্রমাণিত হল শৈলজানন্দের হাতে।

'কল্লোল'-এর মুশকিলটা এখানে ছিল, তার কলধ্বনির পিছনে ঢেউ যতটা আবর্ত তার থেকে বেশি। স্রোত যতটা ফেনা তার থেকে অধিক। সে রূপান্তরের তাগিদ সৃষ্টি করেছিল মাত্র, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়েছিল দেশকাল-পাত্রের অমোঘ অন্বয়ের অন্বেষায়। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পরে আমরা যথার্থ নতুন উপন্যাস পেলাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-তে (১৯২৯-এ, ১৩৩৬ বাংলা সালে)। এ অনুমান দূরনুমান নয়, শতাব্দীর তিনের দশকে পৌঁছোনোর বেশ আগেই বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের সঙ্গে আলাপচারী শুরু করেছিলেন। কী তিনি বলবেন, কী বলবেন না, কোন্ ভূমিতে তিনি পা রাখবেন ভাবতে ভাবতে—তিনি সযত্নে 'কল্লোল'-এর প্রতিস্পর্ধী ভূমিকা থেকে দূরে থাকলেন। কোনো দলবদ্ধ সংকল্প, কোনো দূরদেশাগত চিন্তা বা তত্ত্ব তাঁকে তাড়িত করল না। চেতনা-গহনলোক অথবা শ্রেণীসংগ্রামের মূলস্থ ঐতিহাসিক

বস্তুবাদ তাঁকে ভাবিত করল না। তাঁর নায়ক—যদি তাকে নায়ক বলিই—সে আপন মৌলিকতায় অস্পৃষ্ট থাকল সমসময়ের সমস্ত অবচ্ছায়া থেকে। যে বালক পথের পাঁচালীর কেন্দ্রীয় চরিত্র, যে বালিকা তার সহযোগী তাদের জন্মের অনেক অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ একটা বিশ্বাসে আমাদের ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের নিজের হাতে নির্মাণ করা কোন বড়ো কীর্তি নেই, নেই বিশ্বেতিহাসে বলবার মতো কোনো বড় মাপের কর্তৃপদ নেবার যোগ্যতা—ঘরে এবং পরে আমরা দীন হীন। সর্বত্রই অনিমন্ত্রিত. 'কেহ চাহে না'—কিন্তু আমাদের নিজের বলতে আছে তারাভরা আকাশ, আদিগন্ত সবুজ সমারোহ, মৌসুমি মেঘের বিশাল বিস্তার, জ্যোৎস্না আর নিশ্ছিদ্র মহান্ধকারের বিচিত্র রহস্য। এগুলি ইংরেজের কলোনির গঞ্জনাকে গ্রাহ্য করেনি। 'পথের পাঁচালী'-র নায়ক এমন ভাবে একথাগুলি বলেনি, তার বলার কথাও নয়। একটা কারণে সে আমাদের মনোযোগকে বারেকের জন্য শিথিল হতে দেয় না। মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষাকে—অভাব অনটনকে অগ্রাহ্য করে এই দুই বালক বালিকা প্রমাণ করেছে তাদের প্রাণের অন্যনিরপেক্ষ স্বরাজ-সাধনা। রাজনৈতিক স্বরাজ-সাধনা যখন বিড়ম্বিত, তখন আপন মনে এরা দুজনে গ্রামের পথে প্রান্তরে জঙ্গলে, আদারে বাদাড়ে খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার মৌলিক স্বাধীন উত্তেজনা। অথচ তারা এবং তাদের স্রষ্টা কেউই কোনো কল্পবিহারে মাতে নি। এত পোক্ত এই রচনার ভিত্তিভূমি যে দূর বিস্তৃত নীহারিকা এবং মাঠের ক্ষীণতম কাশফুল সেই ভিত্তির নিয়মে সত্য হয়ে উঠেছে সমান ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ্য এই উপন্যাসের নির্মিতি। শিথিলতার অভিযোগ এ উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে টেকে না তা উপন্যাসটির অন্তরঙ্গ পাঠে স্পষ্ট হয়। ইন্দির ঠাকরুণের গল্প শোনাতে গিয়ে লেখক গোটা উপন্যাসের গোড়াপত্তন করলেন। পরবর্তী পাণ্ডুলিপিতে সংযোজিত দুর্গাকাহিনীর সঙ্গে সার্থক সংযোজনা ধন্য হল বিশ্বেশ্বরী-মৃত্যুর স্মৃতি। এবং এই মৃত্যু-কথার প্রথম উল্লেখে যেন দুর্গাকাহিনীর অতিদূর পূর্বছায়াকে দুলিয়ে দেওয়া হল। ইন্দিরঠাকরুণ কাহিনীর মাধ্যমে এই উপন্যাসের একটি বিশেষ সুরে তার বেঁধে নেওয়া হয়েছে। আমরা জানি এই উপন্যাসে সময়ের অতিপাতকে ব্যবহার করা হয়েছে জীবনের গভীর তাৎপর্য ধরিয়ে দেবার জন্য। সেই কালছন্দ সম্বন্ধে লেখক আমাদের প্রথম থেকেই সজাগ করে তোলেন—'হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ি তুলিলেন, এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাকরুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে। তাহার পর অনেক-

দিন চলিয়া গিয়াছে। শাঁখারী পুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলক চক্রবর্তী ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন টমসন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।' এই বর্ণনাটুকুর মধ্যে রয়েছে নির্বিশেষ থেকে বিশেষে যাবার ইঙ্গিত। পথের পাঁচালী উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে হরিহরের ভিটে ছেড়ে বিদায়। তার করুণ আশাবাদের কালের হাতে পরাভব। যা কিছু ঘটবে তা সব যেন কালের অমোঘ নিয়মে ঘটবে—সে কথাই উদ্ধৃত অংশটিতে বলা হয়েছে। কালের এই প্রতিমা ভাঙা গড়ার খেলা শুধু তো বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালীতেই দেখবেন না, দেখবেন 'ইছামতী'তে, দেখবেন 'অশনিসঙ্কেত'-এও। যেখানে বিভূতিভূষণ সময়ের এই অতিপাতকে উপেক্ষা করেছেন সেখানে তাঁর উপন্যাসশৈলী অবশ্যই শিথিল। যেমন 'দেবযান' যেমন 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। এমনকি তাঁর প্রকৃতি-প্রধান উপন্যাসেও তিনি সময়ের এই ছন্দকে ধরে দেন জীবনের নিয়মে—'আরণ্যক' তার সবচেয়ে অব্যর্থ প্রমাণ।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কোনো অংশ নিরর্থক নয়। কতখানি আবয়বিক বন্ধনে এ উপন্যাসের প্রত্যঙ্গগুলি গ্রথিত, তা বোঝা যায় 'বল্লালী বালাই' খণ্ডটি প্রসঙ্গে। ইন্দির ঠাকরুণের-কাহিনী ইন্দির ঠাকরুণের জন্য যতটা তাৎপর্যপূর্ণ, তার থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ সর্বজয়াকে চিনে নেবার কারণে। সর্বজয়ার অপুমনোভাব, দুর্গামনোভাব ও ইন্দির ঠাকরুণ মনোভাবের মধ্যে যে স্তরগত ও প্রকারগত ভেদ আছে সেটাই সর্বজয়াকে দিয়েছে নানা বৈপরীত্যে জড়ানো মানবীয় বিশ্বাস্যতা। তিনি বইয়ের পাতায় পাওয়া স্নেহের প্রতিমা নন। মিষ্টতা ও তিক্ততায় গড়া আস্তো নারী। শুধু তাই নয়, সর্বজয়াও নিজেকে একদিন ঠিক ঠিক চিনতে পারল ইন্দির ঠাকরুণ প্রসঙ্গেই। সে অনেক দিন পরে, নিশ্চিন্তপুর থেকে অনেক দূরে, বিধবা সর্বজয়া অন্যের বাড়িতে রাঁধুনি। একটা ঘটনার দ্বারা সঞ্চালিত বৈদ্যুতী প্রবাহিনী সর্বজয়ার স্মৃতির যবনিকা সরিয়ে দিল—'এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এই রকম চেহারার ও এই রকম বয়সের—সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরুণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনা ফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে

না, কেউ মানে না, দুপুরবেলায় সেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু…

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।' এই এতদিনে ইন্দিরাবৃত্ত সম্পূর্ণতা পেল। এতদিনে সম্পর্কময়ী সর্বজয়ার সম্পর্কের জটপাকানো খেই সরল হল। সর্বজয়া আপনার কাছে ইন্দির-ঠাকরুণ প্রসঙ্গে যে অপরাধ বহন করছিল সে অপরাধকে সে শনাক্ত করল। এমনি ভাবেই দেখানো যায় এ উপন্যাসে রেলগাড়ি প্রসঙ্গও দুটি বালক বালিকার খেয়ালবশত আসে নি। কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত রেলগাড়ি প্রসঙ্গ। বিভূতিভূষণ বড়ো মাপের শিল্পী বলেই জানতেন, রেলগাড়িকে প্রতীকে রূপান্তরিত করা সমীচীন হবে না। তাকে উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্কে যুক্ত করতে হবে। দুর্গার সঙ্গে নীরেনের দেখা হবার পর হালকা প্রস্তাবে একজন প্রতিবাসিনী নীরেনের বধূ হিসাবে দুর্গার যোগ্যতার কথা পেড়েছেন। নীরেন বহিরাগত। সে আবার বাইরে চলে যাবে। বিবাহ মানেই দুর্গার দূরে চলে যাওয়া। রেলগাড়ি আধুনিক যুগে দূরদূরান্তরের নিমন্ত্রণ জানায়। সে স্থাণু জীবনে রূপান্তরের বার্তাবহ। দুর্গার বর আসবে রেলগাড়ি চড়ে—তাকে রেলগাড়ি করে নিয়ে যাবে—আনমনে, নিজের অলক্ষ্যে এই বালিকা—এই ছুটন্ত স্বভাবের দূরাভি-লাষিণী বালিকা ঠিক এমন করে না হলেও ভেবেছে। অপু দুর্গাকে বলল—

'তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাস্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূরে—রেলে যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়েছে—অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলা চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেললাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, থাকিতে পারে না পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ী যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা। সে ভাইয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

'নল' শব্দটি দুর্গা জানতে পারে। 'চিমনি' শব্দটি তার অজানা। এই বর্ণনা যে তার প্রত্যক্ষ দেখা বর্ণনা নয়—শোনা কথা, তার ভাবনার ভাষাতে তা ধরা পড়ে।

এটাই উপন্যাসের ভাষা। এই ভাষা এই দুই বালক বালিকার ভাষা হয়েও ঔপন্যাসিকের ভাষা। এবং এই ভাষার জোরেই উপন্যাসটির নিহিত স্বর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রেলগাড়ি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হল। তারপরে মৃত্যুর আলোয় দুর্গার রেলগাড়ি অভিলাষ এবং শেষ দিনে রেলগাড়ির জানালা থেকে দেখতে দেখতে অপুর দুর্গার রেলগাড়ি সম্বন্ধীয় শেষ উক্তি স্মরণ আমাদের কাছে মৃত্যুর শোক-স্মৃতির চেয়েও বেশি ধরিয়ে দেয় অদম্য জীবনপিপাসার কথা। এটাই বিভূতিভূষণ। এটাই মহৎশিল্প।

আলাদা করে একটু আমাদের বলতে হয় 'অশনিসঙ্কেত'-এর কথা। 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ দেখেছেন এক জনগোষ্ঠীকে, যারা দিনের পর দিন ভাতের মুখ দেখতে পায় না, মকাই দানা সিদ্ধ আর বাথুয়া শাক যাদের খাদ্য-সম্বল। কিন্তু সে জনগোষ্ঠী সমাজবদ্ধ একটা অর্থনৈতিক সূত্রে স্পষ্টত আবদ্ধ নয়। ভাত তাদের কাছে একটা বিলাস। উপন্যাসটিতে আর্থ-সামাজিক পটে জড়ানো একটা জনপদ দেখা দেবার সঙ্গে কাহিনীর সমাপ্তি। যদি উপন্যাসটি আজ লেখা হত তাহলে যুগলপ্রসাদ হয়তো হত উপন্যাসের নায়ক। আমরা এ উপন্যাসে যেমন একদিকে দেখেছি প্রকৃতির বাধাবন্ধহীন রূপ, অপরদিকে দেখেছি শীতের দুঃসহ রাতে বাচ্ছা ছেলেগুলিকে একটু 'ওম' দেবার জন্য ভূসির টালের মধ্যে আকণ্ঠ গুঁজে রাখা। পক্ষান্তরে 'অশনিসঙ্কেত' আবার সেই ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণের গল্প—যে সতত সচেষ্ট দারিদ্র্যসীমার নিচে যাতে তাকে না নেমে যেতে হয়। দুর্ভিক্ষের মতো বড়ো ঘটনা পথের পাঁচালীতে ছিল না। 'অশনিসঙ্কেতে' দেখা গেল একটা ন্যূনতম জীবন বিন্যাসের উপর দুর্ভিক্ষের মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ ভেঙে পড়েছে। উপন্যাসটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এক, ঘটনাভূমি শহর থেকে অনেক দূরে—এত দূরে যে সেখানকার লোক জানে সিঙ্গাপুর মেদিনীপুরের পাশেই। দুই, সময়ের ছন্দ এখানে অপেক্ষাকৃত দ্রুত মুভমেন্টে চিহ্নিত। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যেতে যেতেই দুর্ভিক্ষ এখানে ঘন হয়ে উঠল। প্রথম মৃত্যুটির ঘটনাকে যথার্থ তাৎপর্যে ব্যবহার করা হল। তিন, নায়ক গঙ্গাচরণ পথের পাঁচালীর হরিহরের মতো দারুণ দারিদ্র্যের মাঝে দুর্মর আশাবাদে চিহ্নিত হয়েও তার আচরণে অনেক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা গেল। চার, সব থেকে বড় কথা অনঙ্গ বৌ চরিত্র পরিকল্পনা। পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার থেকে অনঙ্গ বৌকে অনেক বেশি প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হল। মতির সঙ্গে অনঙ্গ বৌয়ের সখ্য আমাদের বর্ণবিভেদ পরিকীর্ণ সমাজজীবনে কোথায় লুকিয়েছিল তার পরমায়ুর

উৎস সে দিকে ইঙ্গিত করে। সবথেকে বড় কথা এই উপন্যাসে স্বভাববাদের গণ্ডি পেরিয়ে বিভূতিভূষণ চলে আসেন বাস্তব ইতিহাস পর্যবেক্ষণের জটিলতায়। গঙ্গাচরণ অনঙ্গ বৌ এবং আর সকলের স্বরক্ষেপণ থেকে বার করে নিতে হয় ঔপন্যাসিকের নিহিত কণ্ঠস্বরটুকু। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের এই উক্তি 'অশনিসঙ্কেত' উপলক্ষে এবং বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে একটি অব্যর্থ রসবিচার—'ডকুমেণ্টেশনের খুঁটিনাটি বিবরণের ওপরে উঠে আরো এক বড়ো সত্যকে তিনি তুলে ধরতে চান। মনুষ্যত্বের শেষ পরাভবকে তিনি কিছুতেই মানতে পারেন না।' ঠিক কথা দুর্গা ভটচাজ গঙ্গাচরণ আর কাপালীদের ছোট বৌ মিলে যখন মতির শব সৎকারে উদ্যোগী হয়, তখন যেন ইতিহাস নিজেই তার উদাসীন হাতে অনেকদিনের পুরোনো দেনা মিটিয়ে দেয়।

ছয়

শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষভাগে যখন 'পথের পাঁচালী' লেখা হচ্ছে তখন থেকেই তারাশঙ্করের মাথায় ঘুরছে 'চৈতালী ঘূর্ণি'—কালবৈশাখীর অগ্রদূত। ১৯৩১ বই হিসাবে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র প্রকাশকাল। এর বীজ এবং চারার লালন কাল শুরু হয়েছে আরো আগে থেকে—তারাশঙ্কর তখন কারাকক্ষে। তারাশঙ্কর দ্বিতীয় বাঙালি লেখক যিনি ইংরেজ সরকারের জেলখানায় বন্দী জীবনযাপন করেছেন। ভাবলে অবাক হতে হয় প্রায় একই সময়ে বিভূতিভূষণ যখন পথের পাঁচালীর জগতে তারাশঙ্কর তখন চৈতালী ঘূর্ণির জগতে। তারাশঙ্করের আইডিয়লজির দ্বিধা—(যেমন বলেছেন শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য 'সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস : 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২ প্রবন্ধে—) পার হয়ে লেখকের স্বোপার্জিত সামাজিক অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসে মূর্তি ধরে। প্রদ্যুম্ন চমৎকার দেখিয়েছেন একটা সময়ের ব্যাধিগ্রস্ত বিপন্ন সমাজের পটে ধৃত চরিত্রপাত্রদের অসহায়তা বোঝাতে গিয়ে তারাশঙ্কর কোথা থেকে উপমান সংগ্রহ করেছেন। বস্তুত টোপোগ্রাফির সঙ্গে গূঢ়ার্থে অন্বিত এই সকল 'ভিকূল' (vehicle) তারাশঙ্করের আইডিয়লজিক্যাল দ্বিধার চাপ অনেকটা গৌণ করে দেয়। এই উপন্যাসের গঠনশৈলীতে যে লোকায়ত বাংলা কাব্যের সহজ উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করার নাতি দুর্লক্ষ্য প্রবণতা তার দিকেও শ্রীভট্টাচার্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'বরং প্রতিমার ব্যাপারে তাঁর যোগ। দেশজ উপকথা-মহাকাব্য-পুরাণ মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের অনেকটাই লোকায়ত, গ্রামীণ।' আমার মনে

না হয়ে পারে না এ জন্যই তারাশঙ্করের বড় মাপের উপন্যাসে ন্যারেশনের কথকী চাল বা ভঙ্গিমা এত প্রাধান্য পায়।

'গণদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর দেশকালপাত্র জ্ঞান, তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্যবোধ মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। জনজীবন এবং লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিনিবেশ, এই সঙ্গে কালের চলচ্ছন্দ বিষয়ে তাঁর সজাগ অবধানতা এই উপন্যাসকে দিয়েছে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা। এই গ্রন্থের নায়ক দেবু ঘোষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য তথা বর্ণীয় এলিটদের কেউ নয়। সে চাষির ঘরের ছেলে। গ্রামীণ এলিটদের সম্বন্ধে, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্যাটার্ন সম্বন্ধে তারাশঙ্করের জ্ঞান ছিল তীক্ষ্ম। শ্রীহরি চরিত্র পরিকল্পনায় বোঝা যায় ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সত্ত্বেও গ্রামজীবনে হিন্দুসমাজে যে open status group-এর সৃষ্টি হচ্ছিল সেই সচেতনতার লেখক বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যে পদ্ধতিতে শ্রীহরি ঘোষে রূপান্তরিত ছিরে পালের কথা বলেন, তা তাঁর সমাজ জ্ঞান এবং চরিত্রপাত্র জ্ঞান দুয়েরই প্রমাণ। অদূরবর্তী কঙ্কণার ব্রাহ্মণ বাবুদের বর্ণীয় মহিমা কেমন করে ব্যবসায়ী-মহিমাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল, তারাশঙ্কর সেদিকেও অঙ্গুলি সংকেত করেন নির্ভুলভাবে। যিনি একথা বলেছিলেন তারাশঙ্করের লেখার বিষয় হাতে ছিল প্রচুর, কিন্তু তিনি জানতেন না কীভাবে লিখতে হয়, তিনি তারাশঙ্করকে তো বুঝতে পারেন ইনি, এই দেশের বাস্তবতাকেও চিনে উঠতে পারেননি। 'গণদেবতা' উপন্যাসের কাঠামো, ন্যারেশন, চরিত্র কল্পনা লেখকের বিষয়বোধ ও শিল্পজ্ঞান দুয়েরই নিদর্শন। আশ্চর্য এই উপন্যাসের মূল কাহিনীর উপস্থাপক প্রথম পরিচ্ছেদ। যা দীর্ঘকাল ভিতরে ভিতরে ক্ষয়িত, তা কালবৈগুণ্যে এবার ধ্বসে পড়বে। গ্রামীণ শ্রমমজুরি বিন্যাসের পুরাতন প্যাটার্নটি এবার বিদায় নিতে চলেছে।

"নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার সবাই আমাদের (গিরিশ-অনিরুদ্ধের) ধুয়ো নিয়ে ধুয়ো ধরেছে—ওই অল্প ধান দিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জুনতলায় খানকতক ইট পেতে রয়েছে, বলে পয়সা আন এনে কামিয়ে যাও" —এ শুধু গ্রামীণ পুরাতন সমাজে ধাতব মুদ্রামানের প্রতিষ্ঠা নয়, একটা যুগসন্ধির মুখোমুখি প্রাচীন গ্রামসমাজের রূপান্তর-উদ্যত চেহারা। চার্লস মেটকাফ প্রশংসিত সেই গ্রামসমাজ (they seem to last where nothing else last) যে সত্যই অপরিবর্তিত নয়, ওই মন্তব্য যে ইতিহাসের ভুল পাঠ 'গণদেবতা' উপন্যাসের

প্রথমার্ধ তার প্রমাণ। মনে রাখি আমরা তারাশঙ্কর সমাজবিজ্ঞানী নন—ঔপন্যাসিক, শিল্পী, কাজেই সমাজ-তথ্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ যেমন 'Elite conflict in a plural society—Twentieth Century Bengal'-এর মতো গ্রন্থে J. H. Broomfield-এর লেখকরা দিয়েছেন তা তা'র গ্রন্থে মিলবে না। কিন্তু তারাশঙ্কর জীবন-সন্নিহিত মহৎ ঔপন্যাসিক বলেই তিনি যা দেখেছেন, বুঝেছেন, তা আরও বেশি অন্তরময় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ।

সেটেলমেণ্টে বাধা দিয়ে দেবু ঘোষের কারাবরণ পর্যন্ত উপন্যাসটি চলেছে এক লয়ে। লয় বদল হয়েছে এই কারাবরণের ঘটনার পর থেকে। কারাবরণের আগে পর্যন্ত গ্রামের ঘটনাগুলির একটাই ব্যাখ্যা—বর্ণপেশাভিত্তিক গ্রামসমাজ অদূরের উঠতি জংশন শহরের ধাক্কায় কেমনভাবে আলোড়িত হচ্ছে, কেমনভাবে আর্থিক সম্পর্কগুলির রদবদল হচ্ছে, রূপান্তর হচ্ছে, তীক্ষ্ণতা পাচ্ছে বিরোধগুলি। দেবু ঘোষের কারাবরণের কালে "—ওয়েট। চণ্ডীমণ্ডপে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করিল হরেন ঘোষাল। তাহার হাতে একটি অতি সুন্দর গাঁদা ফুলের মালা। মালাখানি সে দেবুর গলায় পরাইয়া দিয়া উত্তেজিত আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়! মুহূর্তে ব্যাপারটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল।" শুধু এই ব্যাপারটিরই নয়, গোটা গ্রামটির চেহারাও পালটাতে শুরু করল। সামাজিক ঘটনাধারা এবারে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাধারার রূপ নিতে চলল। সেটেলমেণ্টের কানুনগো যেন ভারতবর্ষের বিপুল গতিবেগের সঙ্গে গ্রামটির গ্রন্থিবন্ধনের ঘটক। 'তুই আপনি'র ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, লক্ষণীয় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তেও করালীর সঙ্গে বাবুদের এমন তুই-তোকারির ঘটনার ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীহরি পালের 'ঘোষ মশায়' হয়ে ওঠা উপন্যাসের এক দিক, ন্যায়রত্নের মহিমার অস্ত-গমন উপন্যাসের আর একদিক। উপন্যাসে অন্তর্জগত ও বহির্জগতের টানাপোড়েনে দুর্গার ভাবান্তর এক আশ্চর্য অথচ অনিবার্য ঘটনা। যতীন যথাযথ বাস্তবতায় প্রক্ষিপ্ত চরিত্র। দ্বারকা চৌধুরী গ্রাম জীবনের ভাঙাচোরার ভেতর দিয়ে একটা সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকলেন।

অনুবর্তী উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ তারাশঙ্কর তাঁর পটভূমিকাকে আরও বিস্তৃতি দিয়েছেন, ভৌম আর্থনীতিক সম্পর্কের জট ও জটিলতাকে আরো প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। ঈদ সামনে। রহম শেখ একটা তালগাছ কেটেছিল, বিক্রি করে দেবে বলে। 'গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তার দাদু গাছটা লাগাইয়া দিয়াছিল।' 'এ গাছ বেচিবার কল্পনা কোনোদিন রহমের ছিল না।

কিন্তু এবার যে বড় কঠিন ঠেকিয়াছিল।' 'একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। তিন পুরুষের মধ্যে ওই গাছটার স্বামীত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই।' 'তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুজ্যে বাবুকে।' 'রহমের বাপ জমি বিক্রি করিবার পর—বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে—রহমও চষিতেছে। কোনদিন একবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই, জমিটা তাহাদের নয়।' 'গাছটা তাদের নয়' একথা শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' রচনায় রসিক বা কাঙালীরও মনে হয় নি। ঘটনাংশের এই সামান্য মিলটুকু মনে রেখে একটা কথা এখানে বলার আছে। তারাশঙ্কর এ জাতীয় ঘটনার চিত্রণের বেলায় ব্যাপারটিকে দিতে চেয়েছেন 'বাবু' এবং 'অ-বাবু'দের সংঘাতের রূপ। গ্রামীণ উচ্চশ্রেণী আর শহুরে উচ্চশ্রেণী তাঁর জনতার কাছে 'বাবু' অভিধার মধ্যে এক হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র যেমন 'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে গ্রামীণ পুরোধা (রুর‍্যাল এলিট)-দের শ্রেণী ও বর্ণীয় ভূমিকা দুয়ের উপরই সমান জোর দেন—তারাশঙ্কর সেক্ষেত্রে 'বাবু' ও 'অ-বাবু'র প্রশ্নকেই সামনে আনেন। এতে তারাশঙ্কর কিছু ভুল করেন না। শুধু সওয়ালের তীক্ষ্ণতা একটু কমে যায় বলে মনে করি। হেলে বলদের সঙ্গে বাঙালি চাষির সম্পর্ক কতটা বাস্তব মানবিকতার উপর স্থাপিত, ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে সে সম্পর্ক যে মাত্র প্রথাগত সংস্কার—'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র সেটাও দেখিয়েছেন। আমাদের মনে পড়েই 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের তিনকড়ি-রহম শেখের গোরুর ঘটনা। তিনকড়ির গোরু কঙ্কণার বাবুরা ধরে বেঁধে রেখেছিল। তিনকড়ি ও রহম শেখ দুজনে ছুটেছিল সে গোরু ছাড়িয়ে আনতে। রহম বাবুকে বলে—'গরুটাকে মের‍্যা জখম কর‍্যা দিছ শুনলাম? হিন্দু বেরাহ্মণ তুমি?' কিন্তু উক্ত বাবুদের ব্রাহ্মণত্বের বিষয়টিকে সামনে আনার চাইতেও তারাশঙ্কর রহম আর তিনকড়ির সামনে আনতে চাইছেন এক নতুন ব্যবসায়ী চরিত্র—এঁরা কলকাতায় থাকেন। ধান বেচে দিতে মফস্‌সলে এসেছেন। সুতরাং গরিব গ্রাম্য চাষির কাছে কসুর কবুল করতে তার বাধে না। তা বলে তিনি চাষিদের ধান ধারও দেবেন না—সুদ পেলেও না—'ওসব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি।' চাষি হিন্দু মুসলমান অবাক হয়ে যায় নতুন এই বাবু মানুষকে দেখে। বাবুর উপকারের পুণ্যে লোভ নেই, সুদের টাকায় লোভ নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মণটির মতো বাবুটির কোনো স্ক্রুপলও নেই—'ভালোতেও সে নেই; মন্দতেও সে নেই।' এই ভদ্রলোকই ক্ষতিকর

বেশি। 'গণদেবতা'-অংশে আমরা জেনেছি আলিপুরের রহমৎ শেখ আর কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্জে একযোগে ভাগাড় দখল করেছে চামড়ার ব্যবসা করবে বলে। 'বামুনের মেয়ে'-তে গোলোক চাটুজ্যে গোরু চালানের ব্যবসায়ে টাকা খাটানো সংগত হবে কি না একথা দুঃখের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। তার এক দশক পরেই রমন্দ চাটুজ্জেরা চামড়ার ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। বর্ণীয় মহিমা নয়, শ্রেণী মহিমাই তখন হয়ে উঠেছে কাম্য ও লভ্য। এবং তারা আর স্বগ্রামবাসীও থাকছে না। 'গণদেবতা'-র অনিরুদ্ধ কামারদের অনেক আগেই তারা-ই বেরিয়ে পড়েছে গ্রাম ছেড়ে, শহরের দিকে। গ্রামীণ আর্থনীতিক প্যাটার্নের রূপবদলের ব্যাপারে তাদের ভূমিকাও কম নয়।

আগেই বলেছি তারাশঙ্করের গল্পে বর্ণাভিমানের বিষয়টি সামনে আসে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বটে ; কিন্তু পটকে সেটাই মুখ্যভাবে অধিকার করে না। তারাশঙ্করের গল্পে প্রধান হয় নিচের তলায় মানুষের একক ব্যক্তির আত্ম-মর্যাদার অভিমান। এটাকে তার ব্যক্তি-অভিমান বলা যায়—তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজরূপও বলা যায়। তাই 'আপনি-আমি-তুই'-এর ব্যাপারটিকে তারাশঙ্কর খুব চমৎকার ব্যবহার করেন। এতদিন পর্যন্ত 'আপনি-তুমি'-র হেরফের বাংলা গল্পে প্রেমের ঘনীভবন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেই কাজে লেগেছে—তারাশঙ্কর এটাকে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যে প্রয়োগ করলেন। প্রেমের ঘনীভবনে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে অবতরণ কাহিনীকে কতখানি ভেতরের দিক থেকে গতিশীল করে তোলে, কতখানি তা নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে 'গোরা' উপন্যাসের সাতান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদটি তার নিদর্শন। তারাশঙ্করের 'আপনি-তুই'-এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া যায় 'গণদেবতা' উপন্যাসে। দেবুর সঙ্গে সেটেলমেণ্টের কানুনগো 'তুই তোকারি' করেছিল। এর জবাবে দেবুও কানুনগোকে 'তুই তোকারি' করে জুতসই জবাব দেয়। কানুনগো সরকারি কর্মচারী, অবশ্য ইংরেজি শিক্ষিত—দেবু গ্রাম্য পণ্ডিত হলেও চাষির ছেলে। কানুনগো ইংরেজি শিক্ষিত এবং শহরবাসী বলে দেবুর ঘরে জল খেতে পারে—কিন্তু দেবুকে সে 'আপনি' বলতে পারে না। গাঁয়ের 'বাবু' ক্লাশটাই পারে না। দেবুই কী পারে গ্রাম্য পুরোভাগীদের 'বাবু' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে? কানুনগো ঘটনাই তো তার অভিজ্ঞতায় প্রথম দাগ ফেলে নি। তার আগে পুলিশের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টর তাকে 'তুই তোকারি' করেছিল। চাষির ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম—কাজেই সে তার ব্যক্তিত্বের অধিকারে সমানাচরণ দাবি করে—পায় না। মাঝে

মাঝে সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো ম্যাজিস্ট্রেট তাকে 'আপনি' বলে বটে—কিন্তু সেটাও ব্যতিক্রম। কিন্তু এ বিড়ম্বনার বীজ তো দেবুর মনের মধ্যেই। সে যখন নিজের চাষি-বাবার জমিদারের হাতে লাঞ্ছনার কথা ভাবে, তখন সেও জমিদারকে 'বাবু' বলেই অভিহিত করে। অর্থাৎ সে বিশ্বনাথের সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও—ইংরেজিতে দরখাস্ত লিখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে জানে জমিদার—এবং হয়তো ব্রাহ্মণ—'বাবু' অভিধার জন্মগত অধিকারী। এবং সে আর সকলের মতো অ-বাবু।

তবু আত্মসম্মানের দাবিতে মাথাচাড়া দিচ্ছিল গ্রাম সমাজ। কিন্তু সেটাও পুরোনো আর্থিক বাঁধন ছিঁড়তে পারার আগে নয়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় করালী-হেদো মণ্ডল ঘটনা এখানে স্মরণীয়। হেদো মণ্ডল যেই বলেছে করালী সম্বন্ধে 'তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে'—'করালী ভুরু কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হলে হয়তো ভুরু কুঁচকেই মাথা হেঁট করে চলে যেত; কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল—উ কি ? বেটা বেটা বলছেন কেনে ? ভদ্দর লোকের উ কি কথা।' বনওয়ারীর নিজের ভাষাতেই করালীর এই প্রকার বিস্ময়কর আচরণের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাটি মেলে—'ওই চন্নপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ করে দিলে।'

তবু বাবু একটা অর্থনৈতিক পরিচয়ই বটে। শ্রীহরি পাল 'ঘোষ' হবার জন্য সচেষ্ট ছিল—বাবুত্বের দিকেই ছিল তার অভিলাষ। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ন্যায়-রত্নের কাছে শ্রীহরি ঘোষ গিয়েছিল দেবুকে পতিত করার ব্যাপারে—ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলেছিলেন, 'কঙ্কণার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহা-মহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো একজন উপাধ্যায় হে!' ন্যায়রত্ন সামাজিক মর্যাদায় কোনো 'বাবু'র চেয়ে নিচে নন। কিন্তু তিনিও নতুন কালের গ্রাম-নাগরিক এলিটদের প্রসঙ্গে 'বাবু' শব্দটিই ব্যবহার করেন। পৌত্র বিশ্বনাথ একটু কটু ভাবে হলেও এক দিক দিয়ে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা মন্দ দেয়নি—'দেশে নতুন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হলো, ইউনিয়ান বোর্ড, ইউনিয়ান কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজ-পতির বংশ বলে আমাদের, তখন যাত্রাদলের রাজার কথা মনে পড়ে।' কিন্তু পুরো ব্যাখ্যা বোধহয় মেলে ন্যায়রত্নের ট্রাজিক প্রস্থানের মধ্যে। তারাশঙ্করের ট্রাজিক চেতনা আরিস্ততলীয় ট্রাজিক চেতনার ফল। তা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে অনুধাবনের ফল নয়। তবু তারাশঙ্করের পক্ষে একটা কথা বলার

আছে। শরৎচন্দ্রের গ্রাম সমাজ অনুধাবনের অপূর্ণতা কোথায় ন্যায়রত্ন চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তা দেখিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক সামাজিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না-পারার-বিষয়ও পরিষ্কার করে তুলে ধরা হল। গোড়া কেটে দেওয়া বটগাছের অথবা নিজ বাসভূমে নির্বাসিত রাজার আত্মস্থ অন্তরাগ মূর্তি ধরেছে ন্যায়রত্নে। নিঃসন্দেহে প্রস্থানের করুণ অর্থগৌরবে লেখক সে মূর্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অথচ এ অভিযোগ আমাদের যায় না যে, তারাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' (এবং পূর্বগ রচনা 'গণদেবতা'-তেও) ন্যায়রত্ন উপবৃত্তকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন নি। শ্রীহরি ঘোষ দেবু-বৃত্তই এ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রধান বৃত্ত। ন্যায়রত্ন-বিশু-বৃত্ত বেশ খানিকটা দূরগত এবং পরোক্ষও বটে। সে বৃত্তটা দেবুকে মাঝে মাঝে গিয়ে ছুঁয়ে আসতে হচ্ছিল। তবে কি তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন সে বৃত্তটা সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কার্যকারণ সংযোগে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক?

আবার মনে হয় বুঝি বা তারাশঙ্কর বর্ণ এবং শ্রেণীর ভিতরকার জটিল সম্পর্কটি ভেদ করার জন্যে মোটেই ব্যস্ত নন। তার চেয়ে বোধকরি তাঁকে বেশি টানে বর্ণীয় স্বাধিকারের ও মর্যাদা-অমর্যাদার প্রশ্ন। তখন আবার 'বাবু' কথাটি শ্রেণীবাচক না হয়ে বর্ণবাচক হয়ে যায়। 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫) উপন্যাসটিতে তার প্রমাণ আছে। প্রথমত লক্ষণীয় বর্ণীয় ডিটারমিনিজমের বিরুদ্ধে সীতারাম পণ্ডিতের লড়াই। 'গণদেবতা পঞ্চগ্রাম'-এর দেবু এবং 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম—এই দুজনেরই পণ্ডিত উপাধি কর্মবাচক। কিন্তু এই উপাধিটির জন্য দেবুর পরোক্ষ এবং সীতারামের প্রত্যক্ষ বাসনা ছিল। সীতারামের পাঠশালা প্রতিষ্ঠার লড়াই প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই। এর সঙ্গে সে যুক্ত করে নিয়েছিল গ্রামীণ ভদ্রলোক শ্রেণীর বর্ণীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অসম্মানিত 'অ-বাবু'দের পক্ষে মর্যাদা আদায়ের প্রশ্নটি। পাঠশালা বসানোর ব্যাপারে জ্যোতিষ সাহাকে রাজি করানোর জন্য সীতারাম যেসব যুক্তি দিয়েছিল, তার সব শেষেরটি ছিল সব থেকে লক্ষ্যভেদী—'তাছাড়া এ হবে আপনাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা, বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের ছেলেদের তফাৎ থাকবে না। অসম্মান হবে না আপনাদের।' বর্ণীয় স্বৈরাচারের সম্বন্ধে তিক্ত স্মৃতি রয়েছে জ্যোতিষেরও সুতরাং সে চকিত হয়ে মুখ তুললে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রথমে সীতারামের মুখের দিকে, তারপর সামনের দিকে ওই আলো ঝলমল পুকুরের দিকে। কিন্তু জ্যোতিষও জানে, আমরাও জানি, এই সমস্ত আবেগ শেষ

পর্যন্ত ভদ্রলোক হবার আবেগ। ইংরেজি লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে 'এডুকেশনাল মিড্‌ল ক্লাশ' গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা তাদের মধ্যে প্রবল। জ্যোতিষ লক্ষ করেছে, তাদের ঘরের ছেলে এম. বি. বি. এস. পাশ করলে আর 'জল-অচল' থাকে না—সুতরাং পাঠশালা দরকার লেখাপড়ার পথে অগ্রসর হবার জন্য; গ্রামের এস্‌টাবলিশমেন্ট বাধা দিলেও দরকার। তারাশঙ্কর অবশ্য তাঁর কাহিনীকে এই আবর্তের মধ্যে ফেলে রাখেননি। বৃহৎ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা-তরঙ্গের তাড়নায় সে আবর্তকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু 'বাবু'দের স্কুল বনাম 'অ-বাবু'দের পাঠশালার ব্যাপারটি উপন্যাসের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে। 'ন চাষা সজ্জনায়তে'—এই কুৎসিত ছড়াটি উচ্চারণ করেছিল গ্রামের বাবুরা। মাতাল ভদ্রলোক বলেছিল—'চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শৌণ্ডিক ছাত্র। কাগজং কলমং খরচং মাত্র।' সীতারামের উচ্চারণ-রীতির গ্রাম্যতা বাবুদের কাছে বিদ্রূপের বিষয় হয়। সীতারামের পাঠশালাকে 'ইতরতম উপায়ে ময়লায় পরিপূর্ণ করা' হয়েছে। গ্রাম্য দরখাস্ত ছাড়া হয়েছে রাজনৈতিক অভিযোগ সৃষ্টি করে তার পাঠশালা অচল করে দেবার জন্য। এ সবই বাবুদের স্যাবোটেজ অ-বাবুদের আত্মোন্নয়ন প্রয়াসে।

কিন্তু এটুকুই সব নয়। প্রচ্ছন্নভাবে তারাশঙ্কর প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন একটা মধ্যবিত্ত অভিমানকেই। সদ্‌গোপ শিক্ষক মশাইকে দেখে বাবুদের ছেলেরা নমস্কার করলে তা হয় অনুপ্রেরণার বিষয়। ধীরা বাবুর মা সীতারামকে প্রথম অভ্যর্থনার দিন ভূম্যাসন পরিহার করে জমিদার প্রজার সম্পর্ক ভুলতে নির্দেশ দিলে অথবা দেবু-শ্যামু সীতারামকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে আবহাওয়ায় একটা বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি হয়—নানা ঘটনা বিপর্যয়ের পর দেবুকে মা সীতারামের পাঠশালায় ভরতি করে দিলে অথবা মণিবাবু তার পৌত্রকে সীতারামের কাছে লেখাপড়া শেখার জন্য নিয়ে এলে সেটা সীতারামের জয়ের দিন বলে প্রতিভাত হয়। এ-সমস্তের কোনোটাই 'ভদ্রলোক' জীবনবৃত্তের গড়ন ভেঙে ফেলার ব্যাপার নয়—ভদ্রলোকের বিকার সংশোধনান্তে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর আয়োজন। বর্ণীয় অভিমান থেকে মুক্ত হবার জন্য তারাশঙ্করের ব্যস্ততা কম নয়। তাই উপন্যাসে তিনি বারবার আনেন তৎপ্রাসঙ্গিক ঘটনা। ধীরাবাবু কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করেন, বামুনের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে জয়ধর বৃত্তির পর বৃত্তি পেয়ে প্রবল ভদ্রলোক—বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মানুষ হয়ে যায়। কোতালঘোষার কায়স্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক বংশের বালক ছাত্রকে অশিক্ষকোচিত ব্যঙ্গ করলে সেটা ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ব্যাপার হয়ে যায়। পুলিশ সাহেব বৈদ্য বংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও

সন্দীপন মুনির নাম জানেনা দেখে সীতারাম বিস্মিত হয়—ভাবে না বোঝেও না যে এর সঙ্গে বৈদ্য বংশের সন্তান হওয়া না-হওয়ার কোনো প্রশ্ন জড়িত নেই—ওটুকু পুলিশ সাহেবের সমাজ লক্ষণ। বইটা শেষও হল সীতারামকে ধীরানন্দের নমস্কার করার ভিতর দিয়ে।

অথচ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের প্রশ্নটি ব্যবহৃত না হলেও গরিব-বড়োলোকের ব্যবধান-চেতনা এই উপন্যাসের চরিত্রদের মুখ থেকে শোনা গেল। পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই চমৎকার ব্যঙ্গে বর্ণ এবং শ্রেণীর ভেদাভেদের জটিলতা ধরে দেন—'শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত্ত ভিখারী ব্রাহ্মণ তো এক নয়।' সীতারামও সেই ভেদের কথা জানে না এমন নয়। ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে তার বলে উঠতে ইচ্ছা করে—'ওরে তোরা বাবুদের ছেলে, তোদের ঘরে ভাত আছে, সিন্দুকে টাকা আছে। মান-ইজ্জত দালান কোঠার ইটে চূণে চাপা হয়ে মজুত আছে, তোদের এতে কি? কেন গরীবের ছেলেদের পড়ার ব্যাঘাত করিস?' কিন্তু এ চেতনা কখনোই যে পূর্ণ একটা আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ সীতারামের সাধনার লক্ষ্যও তো 'বাবু' তৈরি করা। 'সাঁওতালরা ক্রীশ্চান হয়ে লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হয়েছে, সে শুনেছে। শুনেছে, এইসব ছোট জাত বলে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গবর্ণমেণ্টের ঘরে ভালো চাকরি পায়। কোনরকমে একজনকেও যদি সে সেইরকম করে তুলতে পারে তবে তার আশা পরিপূর্ণ হয়।' সীতারাম নিজে বাবু হয়নি, কিন্তু বাবু সৃষ্টি করার লোভ সে সংবরণ করেনি, করতে চায়নি—বাবুত্বের হাতছানি কত দুর্মর এ তারই এক প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের থেকে তারাশঙ্করের পটজ্ঞান অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ, অনেক বেশি ইতিহাস চেতনায় সমৃদ্ধ—কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিষয়জ্ঞান স্পষ্টতর। বিশেষ, ক্ষুদ্র পরিসরে তা তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী। পরিবর্তনের মোচড়গুলি গ্রামের কোন্ অংশে কেমন ভাবে লাগছে—তারাশঙ্কর তা সবচেয়ে ভালো বলেন। কিন্তু সে পরিবর্তমান শিবির সন্নিপাতে 'আমার স্থান কোথায়' এটা বলতে শরৎচন্দ্রের কোনো দ্বিধা ছিল না।

তাঁর নায়কেরা কোনো পর্যায়েই নূতন-বরণ-কারী রোমান্টিক বুর্জোয়া নয়—একান্ত ভারতীয় জীবন থেকে উদ্ভূত ব্যক্তি। সন্দীপন পাঠশালার নায়ক সীতারাম, গণদেবতার নায়ক দেবু এরা কেউই গ্রামীণ বা নাগরিক এলিট শ্রেণীর অন্তর্গত নয়—বর্ণীয় এলিটও নয়, আর্থিক স্টেটাসের এলিটও নয়। তারাশঙ্করের

সতর্কতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বলে মনে করি। দেবু বা সীতারামের আত্মিক সংকট বলে কিছু নেই। দেবু যেভাবে বস্তুজগৎকে বুঝল, যেভাবে পরিবর্তমান ইতিহাসকে হৃদয়ংগম করেছে সে হিসেবে সে কী নিজেকে দেখেছে বা বুঝেছে? সন্দেহ হয়, তারাশঙ্কর যতখানি তাঁর পটকে বুঝতেন ততখানি তাঁর পটধৃত নায়ককে বুঝতেন কী না। এই ত্রুটি সত্ত্বেও সন্দেহ নেই তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক যাথার্থ্যে।

সাত

একজন ঔপন্যাসিকের প্রধান শক্তি সমাজ এবং ব্যক্তি পাত্রের অন্বয় অনন্বয়ের রহস্যকে, তাদের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিকে সঠিক অনুধাবন। অবশ্যই ঔপন্যাসিক সমাজ-বিজ্ঞানী নন। সমাজবিজ্ঞানের সূতো ধরে তিনি জীবনকে জরিপ করবেন না। কিন্তু এই সামাজিক পটজ্ঞান না থাকলে শক্তিমান ঔপন্যাসিকের শিল্পকৃতিও খণ্ডিত হয়ে যায়। এর একটা বড়ো প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে। জগদীশ গুপ্ত যে পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তাঁর বীক্ষণাগারে পর্যবেক্ষণ করেন তার গুরুত্ব পরবর্তীকালে অনেকেই স্বীকার করেছেন। বর্তমান লেখক বাংলা উপন্যাসের ধারায় জগদীশ গুপ্তকে যথাযোগ্য ভূমিকায় বিচার করেছেন—সেই ভাবে কাজটা বোধ হয় সেই প্রথম। কিন্তু আজ দূরত্বের প্রেক্ষণী ব্যবহার করে মনে হয় জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস সাধনা বড়োই খণ্ডিত। ঠিক যে যে কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে কিয়দংশে আমি জগদীশ গুপ্তের সমধর্মা মনে করি—জগদীশ গুপ্তকে অতিক্রম করে যান, জগদীশ গুপ্তের সেই জীবনবোধ ব্যত্যয় ছিল।

উনিশশো ছত্রিশে যখন শশী-কল্পনা মানিকবাবুর প্রেক্ষাপটে পূর্ণতা পেয়েছে, তখন তিনের দশকের স্রোতসংকট কাটেনি। বত্রিশের আন্দোলনের মূষিক প্রসবের ফলে মধ্যবিত্ত স্বপ্নের ভাঙা ডিম যে জোড়া লাগতে ব্যর্থ, তার প্রমাণ রয়েছে ঠিক সেই সময়ের বাংলা উপন্যাসের ব্যক্তিত্বের আয়তনদৈন্যে। এই আয়তনদৈন্যের ক্ষতিপূরণ ঘটতে পারত যদি চরিত্রপাত্রগুলির অন্তর্গূঢ় আততির জটিলতায় বস্তুবিশ্বের জটিলতার পাঠ-নির্দেশের কোনো দার্শনিক ইঙ্গিত থাকত। এই সময়ের সমস্ত উপন্যাসের ভিত্তিতে যদি কোনো ন্যূনতম উপন্যাসতত্ত্বও রচনা করতে হয় তাহলে বলতেই হয়—কর্মৈষণা ব্যতিরিক্ত ভাবনালীনতার বিড়ম্বনা এ যুগের উপন্যাসের চরিত্রপাত্রে ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে এ যুগের কোনো ঔপন্যাসিক এই অনিবার্য অসংগতির দায় এড়াতে পেরেছেন সেখানে প্রকৃতির মতো কোনো

নিত্য সজীব নিরাময়তাই হয়েছে তাঁর আশ্রয়। কিন্তু প্রকৃতি যত বড়ো আশ্রয়দাত্রী হোক না কেন, সে তো আর আশ্রয় প্রার্থীর শিবির নয়—উপন্যাসও নয় আশ্রয় প্রার্থীর ইতিকথা। তাই ঔপন্যাসিককে ব্যক্তি ও সমাজপটের সম্বন্ধে সংঘাত খুঁজতে হয় উপন্যাসের চরিত্রপাত্রের যাথার্থ্যে। অপু এবং শশীর রচনাকালের মধ্যে কিছু কম প্রায় এক দশকের ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি চরিত্রের অন্তত একটি সাদৃশ্যসূত্র লক্ষ করতেই হয়। আমার কথিত চরিত্রপাত্রদের যাথার্থ্য নির্ণয়ের পক্ষে সে সাদৃশ্যসূত্রটি ও সেই প্রসঙ্গেই বৈসাদৃশ্যের বিপুলতা অনুধাবন বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিণত অপু আর যুবক শশী কেউই নিশ্চিন্তপুর ও গাওদিয়ায় আটকে থাকতে চায়নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে বাঙালি যুবকের আত্মপ্রতিষ্ঠার নানা বাসনাকে একটি সংক্ষিপ্ত কথায় ব্যক্ত করা যায়—মুক্তি-পিপাসা। ভাবনা ও দিনযাপনের ঊনবিংশ শতকীয় বাবুছকগুলি যে ব্যক্তির সঠিক আত্মাভিজ্ঞান সন্ধানের পথে বাধা, এ ব্যাপারটা ইংরেজের ভারতবর্ষের নানা অভিজ্ঞতায় তখনকার যুবকের কাছে স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছিল। প্রেমে প্রকৃতিতে অথবা বাস্তব কর্মৈষণায় প্রতিহত ও বন্ধ্যাদশাগ্রস্ত উপনিবেশ বাবুরক্তের গঞ্জনা তখন ক্রমশ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। 'বেরিয়ে পড়তে হবে', আমাদের চেতনে-অবচেতনে তখন এ কথাটাই গূঢ় ও গাঢ় হতে থেকেছে। অপু যাকে পথের দেবতা বলেছে তিনি আসলে বন্ধন-মুক্তির দেবতা। শশী যাকে ভেবেছে গাওদিয়া থেকে মুক্তি, সেও আর কিছু নয়, বৃহত্তর জীবনপিপাসা।

কিন্তু এখানেই আবার গভীর হয়ে ওঠে দুজনের ব্যবধান। অপু যে বৃহৎ বিশ্বের ডাক শুনেছিল, তার পিছনে ছিল না জীবনের নেতির ধাক্কা। বরং নিশ্চিন্তপুরের প্রকৃতি-জীবন থেকেই অপু সংগ্রহ করেছিল বৃহত্তর জগৎ-জীবন সম্বন্ধে গভীরতর বিশ্বাস। জীবনের বিস্ময়ের পাঠ গ্রহণ শুরু হয়েছে নিশ্চিন্তপুরে, তার প্রথম বর্ণপরিচয় ও বোধোদয় সেখানেই—কিন্তু আরও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে পথের মোড়ের আড়ালে। সুতরাং নিশ্চিন্তপুরের মাটিতে অপু শেকড় মেলতে চায়নি বা পারেনি বলে সে পথের দেবতার ডাকে সাড়া দিয়েছে —অপুর সম্বন্ধে একথা বলা যাবে না। কিন্তু শশী সম্বন্ধে একথা বলা যাবে। বলা যাবে যে, তার গাওদিয়া ছেড়ে যাবার অলীক অভিপ্রায়ের পিছনে ছিল এক সার্বিক নেতির ধাক্কা। গাওদিয়ায় তার অস্তিত্বের বহুগ্রন্থিল জট সে-সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের বহু অমীমাংসার প্রতীক। তার এই জটগুলির পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। 'জীবনটা কলকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার

মতো বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে'—এই মোক্ষম উপমাটির মধ্যে জীবনের যে স্বরূপ ফুটে ওঠে, তা শুধু শশীর জীবনের ব্যাখ্যা নয়। কলকাতা যাদের কপট হাতছানি দিয়েছে কিন্তু গ্রামের অক্টোপাশ বন্ধন যাদের ঘিরে থাকলই, এ তাদের সকলের ইতিকথা। বন্ধুর বিবাহের বাজনার চিত্রকল্পে বরযাত্রীর গুপ্তছবিটি খুবই অর্থবহ। এ বাজনা, এ সমারোহ মনে শুধু দাগ কাটে, ছাপ ফেলে না। প্রথম পরিচ্ছেদে ঘটনারম্ভের পর উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পূর্বকথনের কেতাবি রীতি ধরে শশীর পরিচয় সম্পূর্ণ বলতে গিয়ে লেখক শশীর গোটা সত্তা আমাদের কাছে অনাবৃত করেছেন। তার স্বপ্নে রয়েছে নাগরিক জীবন, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবিলাস, আর তার বাস্তবে রয়েছে গ্রামীণ আর্থনীতিক কাঠামোয় ধৃত এক দুশ্ছেদ্য পিতৃতান্ত্রিক বশ্যতা। 'এ সুদূর পল্লীতে হয়তো সে-বসন্ত কখনো আসিবে না, যাহার কোকিল পিয়ানো, সুবাস এসেন্স, দখিনা ফ্যানের বাতাস'—শশীর স্বগত চিন্তার এই প্রতিফলনে নিঃসন্দেহে ফুটে ওঠে নাগরিক জীবনের জন্য ব্যগ্রতা। সে যখন ভাবে, 'একদিন কেয়ারি-করা ফুল-বাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে,—আলো গান হাসি আনন্দ আভিজাত্য—কিসের অভাব তখন থাকিবে শশীর'—তখন শশীর সে স্বপ্নে ছায়া ফেলে নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্ম-কেন্দ্রিক পুরুষার্থ। শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকানের সামনে বাঁশের মাচার জটলায় শশী যে গল্পগুজব শোনে তা পীড়িত করে—'এতগুলি মানুষের মনে মনে কি আশ্চর্য মিল। কারো স্বাতন্ত্র্য নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি এক সুরে বাঁধা। সুখ দুঃখ এক, রসানুভূতি এক, ভয় ও কুসংস্কার এক, হীনতা ও উদারতার হিসাবে কেউ কারো চেয়ে এতটুকু ছোট অথবা বড় নয়।' শশী এদের কথাবার্তা 'আধখানা মন' নিয়ে 'শান্ত অবহেলার' সঙ্গে শোনে। শশী যেটা বোঝে না, সেটা হল এখানেই শশীর আন্তরিক অসংগতি। আমাদের শশীকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—কিসের জন্য তোমার এ অর্ধমনস্কতা, তোমার এ অবহেলার স্পর্ধা বাপু? এ কথার কোনো সঠিক উত্তর শশীর জানা নেই।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে ধনতন্ত্রের অতি অসম বিকাশের অর্ধস্ফুট কিন্তু বর্ণবাহার ফুল কলকাতা নগরী। শশী তারই ক্ষণিক গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে দেশকাল পাত্রের জ্ঞান হারিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল তার পটভূমির যাথার্থ্য।

বণিক সভ্যতার কাছ থেকে কিছু পেতে গেলে কিছু বিনিময় মূল্য ধরে দিতে হয়। সে তা দেয়নি। অথচ কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকালে তার আকাশে চাঁদের দিকে তাকাতে লজ্জা করে। তার বাস্তবতা কলকাতা নয় গাওদিয়া, একথা যে সে মুহূর্তে ভুলে যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি ভুলে গেলে শশী একটা ডাইনামিক চরিত্র হত, সে সহজেই আপস করে ফেলে তার প্রতিবেশের সঙ্গে। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায় তার গাওদিয়া ভাবনায় একটা পরিবর্তন এসেছে—'জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাসা ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আর মশাভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়।' এই উপলব্ধি থেকে সে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করে। শশীর কাছে 'শান্ত' শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় সে এই বোধ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে যে, পরিবেশ পরিবর্তনের দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। সে বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করে, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সঙ্গে লড়তে চায়। কিন্তু তার এই প্রয়াস অচিরে প্রতিহত হয় এক বহুকালাগত অসামঞ্জস্যের শক্ত দেওয়ালে মাথা ঠুকে। শশী যেটা বোঝেনি সেটা হল, পটভূমির সঙ্গে তার আত্মীয়তা নেই। তার গাওদিয়া বাস অগত্যা। সে গাওদিয়াতেও প্রবাসী। তাই দেখতে দেখতে দেখতেই 'গ্রাম্যজীবনে শশীর আবার বিতৃষ্ণা আসিয়াছে' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। আমরা আজ একথা বলতে পারি তার তৃষ্ণার চেহারা যেমন 'শোনা কথা' মাত্র, তার বিতৃষ্ণার চেহারাও তেমন আবছায়ায় অর্ধসত্য। একটা কথা তাহলেও বোঝা যায়, শশী বাংলা উপন্যাসে প্রথম নায়ক, গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে যার কোনো আবেগই নেই। কলকাতা তাকে আকৃষ্ট করুক, কিন্তু প্রত্যাশিত ছিল—কলকাতা প্রবাস তার মধ্যে গ্রামের জন্য বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার জন্ম দেবে। প্রত্যাশিত ছিল কলকাতায় গিয়ে সে ফিরে পাবে গ্রামের নিসর্গ প্রকৃতির জন্য ব্যাকুলতা। শশীর ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। কলকাতা থেকে ফিরে এসে সে গ্রামে হয়ে গেছে আগন্তুক। বস্তুত সে কলকাতায় যেমন ছিল প্রবাসী, গাওদিয়াতেও তেমনই আগন্তুক। শশী ট্রাজিক চরিত্র নয়, অসংগতির প্রতীক। তার চরিত্র রহস্যের মূলকথা হচ্ছে, সে কোথাওকার কেউ নয়। এই অর্থেই সে প্রতিভূ-স্থানীয় চরিত্র যে সে কোথাও অন্বিত নয়। শশী যে সময়ের চরিত্র-প্রতীক সে-সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবক তার বিড়ম্বিত অস্তিত্বের অসংগতিকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, কিন্তু এস্টাবলিশমেন্ট বা অথরিটি কাউকেই

চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো ক্ষমতা অর্জন করেনি।

গোপাল, যামিনী, কবিরাজ, যাদব—এদের সঙ্গেই শশীর সম্পর্ক 'সংঘাতের পরিচয় উপন্যাসটিতে সব থেকে বেশি উপাদান জুগিয়েছে শশীর পটভূমি নির্মাণে। সেদিক থেকে এ উপন্যাস আধুনিক ভাষায় যাকে আমরা বলি প্রজন্মগত ব্যবধান বা 'জেনারেশন গ্যাপ'—সেই থিম-এর প্রারম্ভিক উপন্যাস।

'শশীর শৈশব কৈশোরের যমটি'কে (শশীর নিজেরই ভাবনা : তৃতীয় পরিচ্ছেদ) শশী কী চোখে দেখেছে, দেখা যাক! গোপালের গ্রাম্য সম্পত্তি-সংকীর্ণ চিত্তদৈন্যের সবটুকু পরিচয়ই তো শশী জানে। শশী তো 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ব্রজেশ্বর নয়, তাহলে কেন সে গোপালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কেন পারে না তার ব্যাখ্যাটাও পাওয়া যায় গোপালের দিক থেকে। 'ছেলে বড়ো হইলে কি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, ওপরওয়ালা নয়, কি যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের ভগবান জানেন?' এটা শুধু গোপালের অনুভূতিই নয়। শশীর অনুভূতিতেও এরই ছায়া। উপরে উক্ত সম্পর্কগুলির যে কোনো একটির ক্ষেত্রেই যে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু সম্পর্ক যেখানে ছেলেবেলা থেকে শুধু ব্যবধানের রচয়িতা, সেখানে কিছু করে ওঠা মুশকিল। 'রাগও হয়, মমতাও বোধ করে শশী।' গোপালের সামাজিক পারিবারিক ও নৈতিক ভূমিকা শশীর অজানা নয়। কিন্তু শশী গোপাল সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য পোষণ করে তা তার কাছে দুর্লঙ্ঘ্য। শশী নীরব উপেক্ষা ও মৌন আনুগত্যের বিমিশ্র প্রতিক্রিয়ায় যেখানে পৌঁছোল, সেখানে সত্তার অবৈকল্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেই শশীর ব্যর্থতা। গোপালের পুত্রস্নেহ আর সম্পত্তিবোধ অপৃথক। পুত্রকেও সে লব্ধ ও লগ্নিকৃত সম্পত্তি বলে ভাবে। সেই মনোভাব নিয়েই সে পুত্রের উপর দখল বজায় রাখল। শেষ কৌশলে তার বেহাত হওয়া আটকাল। সম্পত্তি বেনামি করে সম্পত্তি স্বাধিকারে রাখার ঘটনার সঙ্গে তা তুলনীয়।

শশী-কুসুমের জট আমাদের কাছে নয়, শশীর নিজের কাছেই দুর্বোধ থেকে গেছে। সে যেমন গোপাল বা যাদব কারো সম্বন্ধেই মনস্থির করতে পারেনি, কুসুমের সম্বন্ধেও সে মনস্থির করতে পারেনি। গাওদিয়া যেমন তার সকল নাগরিক স্বপ্নের শ্বাসরোধ করতে চায়, কুসুমও তেমন তার সাধের ফুলচারা মাড়িয়ে দেয়। গাওদিয়ার ভাষা, অর্থাৎ গাওদিয়ার আশা-সাধ-আহ্লাদ-স্বপ্ন যেমন শশী বোঝে না, কুসুমের ভাষার ব্যঞ্জনার্থও শশী বোঝে না, অন্তত

প্রথমটা বুঝতে চায় নি। 'এমন চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু'—এ কথার অর্থ শশী বুঝতে পারেনি বলেই, সময়ের ব্যবধানে সে যখন কুসুমকে বলতে গেল—'আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ', কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে 'না'। এই দিন অর্থাৎ তালবনের এই চূড়ান্ত সাক্ষাতের দিনে শশী কি তার সার কথাগুলো কুসুমকে জানাতে পারল? উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় বৎসরের হিসাবে ন-বছর চলে গেছে। ন-বছর তো এক আধ দিন নয়। কিন্তু এই ন বছরেও শশী কি কুসুমের কথা ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছে? নাকি তখনো সে বাইরের জগতের বর্ণাঢ্য নাগরিকতার সেই অমূল এবং অলীক স্মৃতির পটভূমিকায় রেখে কুসুমকে বিচার করতে চেয়েছে? ন-বছর আগে যে-কুসুম শশীকে বলেছিল যে শশীর কাছে দাঁড়ালে তার 'শরীর কেমন করে', যার জবাবে শশী মনে মনে ভেবেছিল 'শরীর, শরীর—তোমার কি মন নাই কুসুম', আজও শশীর কুসুম-চিন্তা তার থেকে বেশি এগোয়নি। শশী কুসুমকে দেখিয়েছে পুরুষের কাজের জগতের তাগিদ—'সময়ে কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমি রইলে আমিও রইলাম।' এরই উত্তরে কুসুম যখন বলেছিল 'সে তো ন'বছর ধরেই আছি' তখনই শশীর বোঝা উচিত ছিল, কুসুম এইবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তখনো শশী নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে—'এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম্য গৃহস্থের গোবরলেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নাই কেশে নাই সুগন্ধি তেল, তার জন্য বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই। ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ, জগতে সাগরতরঙ্গ আছে।' যে শশী গাওদিয়ায় থেকেও গাওদিয়ার কেউ নয়, সেই শশী কুসুমের প্রেমাস্পদ হয়েও কুসুমের কেউ নয়। আমি আগে যেমন বলেছি গাওদিয়াতেও শশী শেষ পর্যন্ত আগন্তুক, এখনো বলছি কুসুমের কাছেও সে আগন্তুক মাত্র। সে যখন কুসুমকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে তখন সে একদিকে আবিষ্কার করেছে গাওদিয়ায় তার কোনো মূল নেই, আর অন্য দিকে আবিষ্কার করেছে গাওদিয়ায় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অথচ পরিবেশ-নিয়তির অনিবার্য প্রতাপে তাকে একথাও বুঝতে হয়েছে যে, গাওদিয়া তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। এই সময়ই সে একবার মাত্র গোপালের ছেলে না হয়ে শশী হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় আমরা দুটো মানুষের দেখা পেয়েছি—একজন কুসুম, যে পরাজিত হয়েও আপন স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। আর একজন মতি, যে বিজয়িনী হয়েছে গাওদিয়াকে পরিহার করে।

'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে মানিকবাবু ব্যক্তির যে মূর্তি আঁকেন, 'চিহ্ন' উপন্যাসে তা থেকে অন্য চেতনায় উপনীত হলেন। পরিবেশ নিয়তি ছিল তাঁর ওই দুই উপন্যাসে ব্যক্তির প্রতিকূলে স্থাপিত। 'চিহ্ন' উপন্যাসে তিনি যে মানুষের কথা বললেন সে মানুষ তার এবং চারপাশের ভবিতব্যতার প্রতিস্পর্ধী। কীভাবে খুঁজে পেতে হয় জীবনের খণ্ডীভবনের হাত থেকে মুক্তি, কীভাবে পুতুল বা প্রতিমা কিছুই নয়, মানুষ হয়ে উঠতে পারে সমগ্রের সঙ্গে সংলগ্ন—কীভাবে সে বুঝতে পারে অনন্বয়ে নয়, অন্বয়েই তার চরিতার্থতা—'চিহ্ন' উপন্যাসে তার পরিচয় মেলে। মানিকবাবু 'চিহ্ন' সম্বন্ধে টেকনিকের অভিনবত্বের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ তো শুধু টেকনিকের অভিনবত্বই নয়। এই উপন্যাসের কনটেন্‌টূ জ্ঞানের মধ্যেই ছিল তার আঙ্গিকের অনিবার্যতা। এবং যেখানে সে ছাড়িয়ে যায় সমকালীন অনুরূপ বিষয় নিয়ে লেখা আরেকখানি উপন্যাসকে তা হল তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা'। মানিকবাবু ভারত ইতিহাসের এক পর্বান্তরে দাঁড়িয়ে নিজের পর্বান্তরকেও চিহ্নিত করলেন এই উপন্যাসে।

আট

ত্রিশের দশকে অন্নদাশঙ্কর-ধূর্জটিপ্রসাদ-গোপাল হালদার ব্যক্তির যে নিজেকে খুঁজে ফেরার অন্তহীন প্রয়াসকে উপন্যাসে রূপ দিলেন দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালখণ্ডের উৎকণ্ঠা থেকেই তাদের পৃথক পৃথক শিল্পমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' বিশ্বপটে স্থাপিত প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। এ বিষয়ে আমার সাধ্যমত বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' (১৯৬২) বইয়ে করেছি। সেখান থেকে কিছু কথা নিয়ে আমি এখানে একটু আলাদা করে তাকাব গোপাল হালদারের 'একদা'-র দিকে। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে বাদল সুধী প্রমুখের বিশ্বপটে বৌদ্ধিক উদ্বেগ যত সত্য হয়েছে, ঠিক ততটাই সত্য হয়েছে উজ্জয়িনীর সজীব আত্মসমীক্ষা। বস্তুত উজ্জয়িনীই উপন্যাসকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রূপকত্ব পরিণামের নীরক্ত পাংশুলতা থেকে। 'সত্যাসত্য' বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে একটি অন্যতম মুখ্য উপন্যাস যেমন মুখ্য প্রয়াস ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা' 'আবর্ত' 'মোহানা'—এই ত্রয়ী। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তাঁর চরিত্রপাত্রেরা মনন-ধর্মী সমাজপল্লির বাসিন্দা। কিন্তু যেমন বিষ্ণু দে আমাদের অবহিত করেন তেমনটাও সত্য। এই ত্রয়ী উপন্যাসে চরিত্রগুলি উপন্যাসের নিয়মেই সত্য। 'স্বয়ম্ভর' এই শব্দটি বিষ্ণু দে ব্যবহার করেন উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু প্রসঙ্গে।

শুধু খগেনবাবু নন, এই উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলি প্রচলিত বাজারি অর্থে 'life-like' না হয়েও সত্য হয়ে ওঠে এই স্বয়ন্তরতার গুণে। চরিত্রগুলির চিন্তায় তাদের নিজ নিজ চরিত্রের প্রতিফলন, এই অনিবার্য পদ্ধতিতে চরিত্রগুলি চিন্তাশীল—স্বভাবতই চিন্তাস্রোত চরিত্রবান। এ কথায় একটা বিপদও ছিল। তার নির্বাচিত ব্যক্তিপাত্রগুলি নৈরক্তো ভুগছে বলে মনে হয়েছে। বাস্তবের তাগিদ যেখানে তীব্র সেখানে এ নৈরক্ত্য শেষ পর্যন্ত টেকনিককে সর্বস্ব জ্ঞান করে। 'আবর্ত' অংশে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর চিন্তাজীবী নায়ক নায়িকাদের হাতে এক এক টুকরো বাস্তবের জলন্ত অঙ্গার খণ্ড তুলে দিতে। তাতে লেখকের দায় মেটে। কিন্তু তাঁর পাত্রপাত্রীদের দায় মেটে কি?

গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'-র আঙ্গিক সচেতনতা সেক্ষেত্রে অধিকতর লক্ষ্যসিদ্ধ শৈল্পিক অভিপ্রায়ে বিশিষ্ট। যে অর্থে প্রতিটি দিনই অনন্তের স্বাক্ষরে ধন্য—প্রতিটি দিনই রূপান্তরের ইতিহাসের এক এক পাতা, সেই অর্থে 'ত্রিদিবা'র দিন তিনটি একই সঙ্গে প্রাক্তনের ধারক, ঘটমানের দলিল, সমাসন্নের বার্তাবহ। অভিজ্ঞতার যে শেষ নেই, তার যে কোথায় আরম্ভ, কোথায় মধ্যপর্ব, কোথায় বা পর্বান্ত এ যেমন বলা যায় না, ত্রিদিবার নায়ক অমিতের 'হয়ে ওঠা'-রও তেমনি শেষ নেই। প্রতিটি পর্বের বিবৃত সমাপ্তি সে দিকে ইঙ্গিত করে। Only in intense living do we touch infinity—অমিতের এই উক্তিকে শঙ্খ ঘোষ অমিত চরিত্রের ব্যাখ্যাসূত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। 'একদা' অংশে যা ছিল প্রস্তুতিঘন মানসিকতার দিকে অমিতের যাত্রা, 'অন্যদিন'-এ সেই মরমি মানুষের কর্মী মানুষে দীক্ষা গ্রহণ। 'আর এক দিন'-এ অমিত ইতিহাসের সহযাত্রী—পুরোপুরি সে ইতিহাসের মানুষ। এই ক্রমাগত চলায় অমিতের ব্যক্তিস্বরূপের যে উদ্ভাসন সে সম্বন্ধে শঙ্খ ঘোষের ব্যাখ্যাটি স্মরণীয়—'যখনই কোনো কাজের দায়ে এসে পৌঁছই আমরা, তখনই বুঝতে পারি যে, নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়াই হল আমাদের প্রধান এক সমস্যা, কেননা সকলের সঙ্গে মিলবার পথে আমাদের অহংই হয়ে দাঁড়ায় বড়ো বাধা। আত্মসচেতন মানুষ বুঝতে চায় সেই বাধার পরিমাণ, অতিক্রম করতে চায় তাকে, তার আত্মপরিচয় ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দেখা দিতে থাকে তার দেশের পরিচয়ের মধ্যে, তার কালের পরিচয়ের মধ্যে।' আত্মাবগাহন ও আত্মমোচন অমিতের চলার নিত্য লক্ষ্য। শঙ্খ যাকে 'অহং' বলছেন, যাকে বলছেন 'বাধা' তা থেকে মুক্তির প্রয়াস অবশ্যই উপমান খুঁজে পেয়েছে আলোক প্রসঙ্গে। 'ত্রিদিবা'-য় আলো প্রতীক হিসাবে

ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা বলা যদিও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্বময় অনুষঙ্গবাহিতা 'ত্রিদিবা'-য় যেন একটা 'মোটিফ-এর ভূমিকা নিয়েছে। 'একদা'-র শুরুতে কলকাতার শীতের ঘোলাটে ধোঁয়াশা তারপরে সকালের উজ্জ্বল রৌদ্র। 'একদা'-র শেষে 'অমিতের চোখে পড়িল, ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নতুন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে।' মাঝে মাঝেই আছে আলো : অন্ধকার : রৌদ্র : ছায়ায় ভাষায় অমিতের আত্মকথন। অমিত যতই শেকসপীয়র অনুরাগী হোক, যতই হ্যামলেটীয় ভাবনাপুঞ্জে তার আধুনিক অনুভূতির আলোড়ন হোক আসলে সে রবীন্দ্রভূমির মানুষ। আলোর দিকে তার যাত্রা।

রমেশচন্দ্র সেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যখন দেখা দিয়েছিলেন সে সময়টা তার দিক থেকে এবং বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের দিক থেকে ছিল এক বিশেষ তাৎপর্যে স্পন্দিত। তাঁর দিক থেকে বলছি এ কারণে যে, বয়সের বিচারে তিনি তখন পরিণত। প্রথম তারুণ্যের আবেগময় দুঃসাহসের কাল তিনি তখন পেরিয়ে এসেছেন অনেকদিন। যে বয়সে ভাষা নিয়ে, বিষয় নিয়ে অথবা সম্পর্ক নিয়ে নতুন নিরীক্ষার চ্যালেঞ্জ নবীন ঔপন্যাসিককে চঞ্চল করে তোলে, সে বয়স তখন তাঁর নেই। প্রৌঢ় প্রশান্তি, শান্ত বিষয় বিচার ও তন্নিষ্ঠ অনাসক্তি যে বয়সের সাধারণ ধর্ম—সেই বয়সে রমেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলি লিখেছেন। অথচ এ বয়সের যেটা প্রধান লক্ষণ—কখনো কখনো যেটা দুর্বলতা হয়েই দেখা দেয়—অতীত স্মৃতিলোকে বিষণ্ণ বিহার—সেটা রমেশচন্দ্রেব লেখায় নেই। তাঁর কোনো লেখাই নষ্টযৌবন বয়স্কের নস্টালজিয়া নয়। একথা ভাবলে বরঞ্চ আমাদের অবাক হতেই হয় যে, তিনি তাকিয়ে ছিলেন তাঁর অব্যবহিত বর্তমানের দিকে—টের পাচ্ছিলেন অভিজ্ঞ বৈদ্যের মতোই স্পন্দমান ভবিষ্যৎকে। ঔপন্যাসিক হিসাবে এখানেই তাঁর মানসিক উৎকর্ষের পরিচয়। তারই প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসে।

আর, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের যে পর্যায়ে তিনি দেখা দিয়েছেন তার তাৎপর্যটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি গ্রামীণ পটভূমিকাকেই মুখ্যত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সে গ্রাম কুঁয়াপুর নয়, সে গ্রাম গাওদিয়া নয়, সে গ্রাম কেতুপুর নয়, এমনকি সে গ্রাম নবগ্রামও নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গাওদিয়া-কুঁয়াপুর-নবগ্রাম পালটে গেল বাইরের আঘাতে, ভিতরের তাগিদে। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া দ্রুতছন্দ হয়ে উঠল। ব্যক্তিপাত্রগুলি ঘটনার অভিঘাতে নতুন অভিজ্ঞানাভিমুখী

হয়েছে। সমস্যাটা ব্যক্তিবৃত্তে আটকে থাকল না। যে মনোলৌল্যে শশী বা কুসুমের দিবারাত্রির কাব্য গুঞ্জরিত হতে পারে, তা ডুবে গেল আকাশের আর্তনাদে, পরে তেভাগার সিংহগর্জনে। এটাই মহাকালের নব নাট্য। মন্বন্তর আর দেশবিভাগের ধাক্কায় গ্রামীণ সমাজের সম্পর্কের ছক এবং বহুকালাগত শক্তিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। তারাশঙ্কর তাঁর গণদেবতা পঞ্চগ্রামে অথবা হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় সংক্রান্তির পটভূমি ও পটধৃত চরিত্রের সংঘাতময় নাট্যকে উপস্থাপিত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হারাণের নাতজামাই এর মতো গল্পে পরিবর্তমান মূল্যবোধের বিশ্লেষণ ঘটিয়েছেন। ঠিক এমন সময় দেখা দিয়েছেন রমেশচন্দ্র সেন।

অর্থাৎ তিনি স্বয়ম্ভূ নন। বাংলা উপন্যাসের বাস্তব চেনাচিনির এক অনিবার্য ইতিহাসকে অঙ্গীকার করেই রমেশচন্দ্রের লেখনিধারণ। শৈল্পিক তাগিদের সঙ্গে এই নৈতিক অবধানতার সহযোগে সংযোগে তাঁর ঔপন্যাসিক মানস স্বাতন্ত্র্য পেল। 'গৌরীগ্রাম' তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পটভূমিকা গ্রামীণ বটে, কিন্তু সেই পটের উপরেই মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের যে আলেখ্য দেখতে দেখতে ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে বহির্বিশ্বের তাপ ও শৈত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। এই প্রাকৃতিক উপমানে বস্তুত খুঁজে পাই উপন্যাসটির চলিষ্ণু জীবনস্রোতের ঐতিহাসিক স্বরূপ। ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার কথা পরে হবে—আপাতত এটাই আসল কথা যে, মধ্যবিত্ত নাগরিকতার হাতছানিকে ফিরিয়ে দিয়ে রমেশচন্দ্র উপন্যাসের উপাদান খুঁজেছেন গণজীবনের গহনে। 'গৌরীগ্রাম' সেদিক থেকে দৃঢ়লক্ষ্য রচনা। অথচ যা হতে পারত, এবং হলে উপন্যাসটি ডুবত, রমেশচন্দ্র সযত্নে তা দূরে সরিয়ে রেখেছেন। সেটি হল রাজনৈতিক 'ব্যানার' নির্দেশিত স্লোগানজীবী চরিত্রের অবতারণা। অব্যর্থভাবে আমাদের কাছে গোলাপী গোকুল মাণিকের অভিজ্ঞতা থেকে লেখক যে গল্প ও ঘটনাবিন্যাস, অর্থাৎ স্টোরি ও প্লট নির্মিতিকে পেতে ধরেন, তার অনন্যতা রসমূর্তি পরিগ্রহ করে। এদের কারো জীবনই গ্রামীণ অনড়তায় অবরুদ্ধ নয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘনঘটা তা তাদের থাকতে দেয় নি। নৌকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, বাজারে চাল উধাও,—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জটিল হয়ে ওঠে, দেশে নামে আকালের ছায়া। সম্পর্কের সুতোগুলোয় টান পড়ে—তার উপর চাপও পড়ে। এর যে গল্প, তা এক দশকের রূঢ় অভিজ্ঞতাই বটে! মানুষগুলির ধীর পরিবর্তন অভিজ্ঞতার ধাক্কা ধাক্কায় ঘটেছে। গল্পও সেটাই।

গোকুলের ঘরছাড়া জীবন, তার ভিক্ষাবৃত্তি, তার মানসিক উদ্‌ভ্রান্ততা—সব শেষে তার মৃত্যুবরণ—গোলাপীর গল্পের অংশ শুধু নয়, তা গোলাপীর অস্তিত্বেরও অংশ। গোকুল দুর্ভিক্ষের দিনে চেয়েছিল মানুষ যেন স্তূপীকৃত খাদ্যবস্তুর দিকে অসহায় ক্ষুধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শেষ নিশ্বাস না ফেলে। তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেড়ে খায়। তার অবদমিত ক্রোধের অনিবার্য ফল হয়েছে মানসিক ভারসাম্যচ্যুতি। ভারসাম্য সে পরে ফিরে পেয়েছে চূড়ান্ত অ্যাকশনের রক্তাক্ত প্রহরে। মৃত্যু দিয়ে সে সামাজিক অপচারের বিরুদ্ধে তার শেষ স্বাক্ষর এঁকে দিল। সময়ের বুকে দাগ এঁকে সে বিদায় নিল। তার শব সৎকারের বর্ণনা মনে করলেই তাকে তুলনা করতে ইচ্ছে করে এই উপন্যাসেরই আর একটি শবদাহের সঙ্গে—পিসির শবদাহ। এই দুটি মৃত্যু দুই দিক থেকে জীবনের উপরেই আলো ফেলেছে—দুই ভাবে অবশ্য। পিসির মৃত্যু একটি পুরাতন জীবনাচরণের প্যাটার্নের মৃত্যু। তা সত্যই উপসংহার। গোকুলের মৃত্যু এক অর্থে গোকুলের দুঃখলাঞ্ছিত ব্যক্তিজীবনের উপসংহার, কিন্তু সমষ্টিজীবনের দিক থেকে ভাবলে, সে মৃত্যু গৌরী-গ্রামের নতুন জীবনের উপক্রমণিকাও বটে।

রমেশচন্দ্র পিসির মৃত্যুকে উপন্যাসোচিত ব্যবহারে কীভাবে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলতে পেরেছেন তার জন্য একটু উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

'উপরে হিজল গাছ. চিতায় কতকগুলি হিজল ফুল ছড়ানো, তাছাড়া দু-চারখানা আধপোড়া কাঠকয়লা ও ভাঙা পাটকাটি।

কুমি ধীরে ধীরে চিতার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকে, 'পিসি, অ পিসি।'

পিসি সাড়া দেয় না।

কুমি একটু পরে, কাপড়ের তলা হইতে মাটির একটা পুতুল বাহির করিয়া চিতার উপর রাখিয়া বলে, 'অর লগে খেলিও পিসি। খেলিও কিন্তু। অর নাম সাবি—সাবিত্রী। ও একজন সতী।'

যাওয়ার সময় পুতুলটাকেও বলিয়া গেল, খেলিস কিন্তু।'

'ও একজন সতী'—এই কথাটুকুর মধ্যে আছে পিসির জীবন মরণের দুই বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরা সংস্কারের সত্য। যে বিশ্বাসের জগতে পিসি থেকে কুমু সকলেই বাস করে, সমগ্র ঘটনাংশটি সেই বিশ্বাসকে স্বীকৃতি জানায়। এটা অবশ্য দ্বিতীয় কথা। কিন্তু এর পরেও একটা কথা থাকে। সেটা অনুমেয়। পুতুলটি রেখে গিয়ে কুমু যেন তার স্বপ্নের শৈশব থেকে বিদায় নিল। রমেশচন্দ্র খুব সংযত লেখক।

উচ্ছ্বসিত হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু তাই বলে রমেশচন্দ্র ভিতরের জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন নন। মানুষ কত মানবিক—ছোটো মেয়েটির পুতুলদানের ঘটনা তা যেন উজ্জ্বলভাবে মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

এই অংশটি পড়তে পড়তে স্বতই মনে হয়—পিসির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন গৌরীগ্রামের মধ্যযুগের অবসান হল। ঠিক এমন করে কথাটি রমেশচন্দ্র বলেননি। বললে তা হয়ে যেত 'পথের পাঁচালি'তে ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর পরে বিভূতিভূষণের কথার প্রতিধ্বনি। তথাপি এই দুই মৃত্যুও একটা তুলনা-বিচারকে আকর্ষণ করে অনিবার্য টানে। ইন্দির ঠাকরুণ সর্বজয়ার সম্পর্কে ননদ। দুর্গার পিসি সে। সম্পর্কিত হয়েও তাকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। মরতে হতে হয়েছিল পথে—নিরাশ্রয়ের মতো। গৌরীগ্রামের কুমু যাকে পিসি বলছে সে কিন্তু গোলাপীর কেউ নয়। তথাপি গোলাপীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব জীবন্ত। পিসি-গোলাপী সম্পর্ক, পিসির মৃত্যু, গ্রামস্থ সকল মানুষের পিসির শবসৎকারে মহাসমারোহে যোগদান প্রমাণ করে রমেশচন্দ্রের সময়জ্ঞান ও সমাজজ্ঞান। সময় যে পাল্টাচ্ছে, একথা ভালো করে বলার জন্যই সময়টা কেমন ছিল তা ঠিকভাবে ধরিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। সে কাজটাই এখানে লেখক করেছেন। পিসির শবসৎকারে সামাজিক ও গ্রামীণ সংহতির অক্ষুণ্ণতার পরিচয় মেলে। যে গ্রামীণ সংহতি একটু পরেই ক্ষুণ্ণ হবে, তার শেষ পরিচয় এখানে। গোকুলের শবসৎকারে দেখা গেল পুরানো আনুষ্ঠানিকতার কিছুই রক্ষিত হল না। শুধু কোনো রকমে মুখাগ্নিটুকু মাণিককে দিয়ে সম্পন্ন করা হল। একটায় সাড়ম্বর জন সমাবেশ, আরেকটায় সতর্ক, ব্যস্ত দ্রুততা—ঘটনাপটের স্বভাব নিয়মে তার সেই হন্তদন্ত ব্যস্ততা অশোভন হলেও অসংগত হয়নি। দ্বিতীয় শবদাহ একথা বুঝিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম সমাজের সেই পুরানো কাঠামোয় ভাঙন ধরেছে। গ্রামীণ মানুষেরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যেতে বসেছে ততদিনে। এই শক্তিবিন্যাসের নতুন অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সময়ের চাকার এগিয়ে চলা। দুটি ঘটনা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে লেখকের দেশকাল পাত্র সম্বন্ধীয় সচেতনতা। এর মাঝখানে ঘটে গেছে নিস্তারের মৃত্যু। আশ্চর্য! এ বইয়ে একটাও বলবার মতো জন্ম-বৃত্তান্ত নেই। আছে শুধু জায়মান চেতনার জীবন্ত রেখাচিত্র।

চারের দশকে রাজনৈতিক রূপান্তরের ছন্দ দ্রুত হয়েছে। সময়ের ঘোড়া দুলকি চাল ছেড়ে এবার জোর কদম। পথবিপথ ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাবে এবার। রাজনৈতিক উপন্যাসের পালা শুরু হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন',

তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা'য় সময়ের অশ্বক্ষুরধ্বনি তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই পরিবর্তমান দ্রুতলয় জীবনের পটে যে উপন্যাস লেখা হয়েছে তার আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও দেখা দিল নানা ভাঙন গড়ন। কিন্তু এই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে আলোচনায় অগ্রাধিকার পায় 'জাগরী'—রাজনৈতিক উপন্যাসের সঠিক সংজ্ঞায় যাকে চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না। 'ধাত্রী দেবতা'য় তারাশঙ্কর দেখিয়েছিলেন বিপুল ভারতীয় গণ আন্দোলন কেমন করে একটি পরিবারকে খণ্ডীভবনের হাত থেকে রক্ষা করল। 'জাগরী'তে সতীনাথ ভাদুড়ী দেখালেন গণ আন্দোলনের আরেক পর্যায়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘর্ষে কীভাবে একটা পরিবার এক অপ্রতিরোধ্য ঐতিহাসিক নিয়তির আঘাতে ব্যবহিত হয়ে গেল। এখানে সতীনাথের অশেষ কৃতিত্ব যে তিনি চরিত্রগুলিকে রাজনীতির নিয়মে সিদ্ধ করে তোলেননি। ব্যক্তিজীবনের মৌলিক স্পন্দনে তারা সিদ্ধ। চারের ও পাঁচের দশকে সতীনাথ ঔপন্যাসিক কৃতিত্বে সর্বাগ্রগণ্য। এই অগ্রগণ্যতার প্রাথমিক কারণ সহজ সহৃদয় পাঠকের কাছে প্রথমেই ধরা পড়ে। এক, কলকাতা তাঁর বিষয় হয়নি কখনোই। এমনকী বড়োমাপের কোনো নগরকেও তিনি পটভূমিতে নিয়ে আসেন-নি। ছোটো মাপের মফস্‌সল শহরের মধ্যবিত্ত জীবন অথবা সেখানকার জনপদ পরিধিকে মাত্র ছুঁয়ে আছে এমন অন্ত্যবাসী মানবগোষ্ঠী তাঁর উপন্যাসে সর্বার্থ-সাধক হয়েছে। দুই, তাঁর সবকটি উপন্যাস একে অন্যের থেকে 'থিম'-এ, আঙ্গিক-রীতিতে সম্পূর্ণ আলাদা। আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে পাওয়া যায় তাদের বক্তব্যগত স্বাতন্ত্র্যের সঠিক তাৎপর্যের হদিস। তিন, তাঁর সবকটি উপন্যাসই শেষ হয়েছে অস্তিত্বের এক বিষাদঘন নিয়তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে।

ঢোঁড়াই সতীনাথের তো বটেই বাংলা উপন্যাসেরও নায়ক কল্পনার ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। জন্মগ্রহণের পর থেকে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পরে কোর্টে সারেণ্ডার করার প্রাঙ্‌মুহূর্ত পর্যন্ত ঢোঁড়াইকে আমরা দেখেছি জীবনের নানা ফের, নানা স্তর, নানা সন্ধি সংকট পেরিয়ে যেতে। এ কারণেই সতীনাথ এই উপন্যাসের জন্য ব্যবহার করেন রামচরিতমানসের 'ফ্রেম'। ফ্রেম যাই হোক ঢোঁড়াইয়ের বিকাশমান চেতনার প্রতিটি পরতকে, তাদের পারস্পরিক ছন্দকে লেখক কোথাও টাল খেতে দেননি। ঢোঁড়াইয়ের প্রথম ভোটদান এবং তার রামায়ণ পাঠের ইচ্ছা—এই দুই ঘটনা কেবল উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করি। পট পরিবেশ এবং ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের প্রশ্নে অবশ্যই কোনো মিল নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে পড়ে যায় হাওয়ার্ড ফাস্টের 'ফ্রিডম রোড' উপন্যাসের

-নায়ক গিডিয়ন জ্যাকসনের প্রথম ভোটদান এবং প্রথম শেক্সপিয়র পাঠের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা।

ঢোঁড়াই চরিতকার ঢোঁড়াই প্রসঙ্গে বারে বারে রামের কথা স্মরণ করেছেন। তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ন্যূন আদর্শে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের মানুষের মন ভরে না। তিনি আরও ভেবেছিলেন এ যুগের রামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। তিনি জেনে-ছিলেন রামায়ণের ফর্ম্ ও কাঠামো এ কাজের পক্ষে খানিকটা কৃত্রিম মনে হতে বাধ্য। কিন্তু রামকথার ট্র্যাডিশন ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারতবর্ষের মানুষের রক্তে মজ্জায়। রামকল্পনা সতীনাথের আধুনিক জীবনভাবনাকে মদত দিল অন্য নানাদিক থেকে। ভারবহনক্ষম, ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব সংঘাতে ন্যায় ও সত্যকে আঁকড়ে ধরা, কর্তব্য পালনে অবিচলতা, ব্যক্তিগত সংকটের মধ্যেও মানবহিতের সংকল্পকে মনে অটুট রাখা—এগুলিই রাম ট্র্যাডিশনের মোট কথা। তাই ঢোঁড়াই কল্পনায় রামছায়া লেখকের কাছে আবশ্যিক মনে হয়। রামের ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে প্রোজ্জ্বল হয়েছে অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে যাবার পর। যখন সুখের পাত্রটি পূর্ণ হবার মুখোমুখি তখনই সে পাত্র যেমন চূর্ণ হয়ে গেল রামের, তা চূর্ণ হয়ে গেল ঢোঁড়াইয়ের। রাম এবং ঢোঁড়াই এর পরে বৃহত্তর পটে বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে খুঁজে ফিরেছে নিজ নিজ সৎস্বরূপ। তথাপি একথা সত্য যে, ঢোঁড়াই রামকল্প হয়নি। সে এ কালের নায়ক। এ কালের মাপেই তাকে গড়ে নিয়েছেন সতীনাথ। ঢোঁড়াইকে বুঝতেই হয় আধুনিক জীবনের ধনতান্ত্রিক সমাজের স্বরূপ তার নিজের ভাষায়—পাটের দামের রাজা, কাপড় কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদার হাকিম দারোগা ফৌজের রাজা—শোষক শাসক এভাবে বোধহয় ব্যাখ্যাত হয় ঢোঁড়াইয়ের কাছে। নিজের ভিতরকার ধাক্কায় আর বাইরের ধাক্কায় প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল তার নিজেকে চেনা। সকলের সব সত্য পালনের পথেই খুঁজে নিতে হল তার নিজের রক্তাক্ত গহন সত্তার নির্জনতা।

'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসের প্রারম্ভে রয়েছে একটা গাছ—শেষেও রয়েছে সেই গাছটাই।[১] এই যজ্ঞডুমুরের গাছটা কাটব কাটব করেও কাটা হয়ে ওঠে না। এই গাছটার ছায়া অনেকদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। গাছটা থেকেই হরিদাস

---

১. শ্রীপার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে এবিষয়ে চিন্তান্বিত হয়েছি এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মহৎ লেখকের শেষ উপন্যাস' ('সতীনাথ স্মরণে') প্রবন্ধটিতেও গাছটির প্রতীকী ইঙ্গিতের কথা বলা হয়েছে—ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ব্রহ্মচর্য-পোষক রস সংগ্রহ করে, গাছটা থেকেই সে পড়ে গিয়ে পা ভাঙে, গাছটার ডালেই সে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে। গাছটার সঙ্গে হরিদাসের মিল আছে—সে শুধু ছায়া বিস্তার করতে পারে, সে সুবোধবাবুর বাড়ির ফটকের বাইরের অস্তিত্ব, তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়াটাই দরকার ছিল—সেটা হয়ে ওঠেনি। হরিদাসের আত্মহত্যার পর সেটা আপনিই সম্পন্ন হবে। গাছটা আমার, কি আমার নয়, গাছটা কাটার হক্ আমার আছে কি নেই—এখন নানা জট নানা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আমাদের জীবনের বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। সুবোধবাবুর সংসারে হরিদাস-সমস্যাও তাই। হরিদাসের ওপর কার এক্তিয়ার—সুবোধবাবুর না অতসীবালার—সুবোধবাবু সেটাই ঠিক করতে পারলেন না। সুতরাং গাছটা একটা অনাত্মীয় অথচ আত্মীয়তালিপ্সু অস্তিত্বের প্রতীক—উপন্যাসের চরিত্রপাত্রগুলির মধ্যে হরিদাসের অস্তিত্বের প্রতীক—যজ্ঞ-ডুমুরের গাছের মতোই তারও বড়ো বড়ো পাতার বাক্যজালে ঢাকা আড়ম্বর—ব্রহ্মচর্যের কৃত্রিম কিংবদন্তি; শিকড়ের জোর নেই—বস্তুত ভূমিকাবিহীন। হরিদাসের মৃত্যুর পরেই যেন গাছটাও তেজ হারিয়ে ফেলল—এবার তার ছায়া ছোটো হয়ে আসবে। লক্ষণীয়, হরিদাস থাকলেই গাছটা সকলের নজরে আসে—হরিদাস মরে গেলে গাছটিও 'রিয়্যালিটি' হারিয়ে ফেলে।

গাছটির প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো গাছের ভূমিকা নেই। হরিদাস যা প্রতীয়মান হতে চায় তা সে নয়, চিত্রাসখী যা নিজেকে মনে করাতে চান তা তিনি নন—অ্যাপিয়্যারেন্স্ ও রিয়্যালিটির এই কাটাকুটি খেলা এই উপন্যাসের মূল বিষয় ও আশপাশের বিষয়কে একত্র অন্বিত করে রেখেছে। 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি চলছিল যখন, সেই সময়ের বিচিত্র ভাবনার নানা ইঙ্গিতবহ লেখকের ডায়েরি[২] থেকে এই অংশটি পাওয়া যায়—

> The ambiguity of truth, the conflict of appearance and reality, the rival claims of secret and social life—these are now integral to modern fiction in its major manifestation.

এই উপন্যাস সেই মেজর ম্যানিফেস্টেশনের দুটি স্তর। একটি হল সুবোধবাবুর পারিবারিক জীবন—যে সংসারে কর্তার নাম সুবোধ হলে ছেলের নাম হয় সুশীল—একেবারে ছকে বাঁধা—অপরটি হল বৃন্দাবনের আশ্রমজীবন—চিত্রাসখী যেখানে

২. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত সতীনাথ গ্রন্থাবলীর (চতুর্থ খণ্ড) পরিশেষে প্রদত্ত 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ' (পৃষ্ঠা ৫৮৯) থেকে উদ্ধৃত।

কাঁচুলিতে বাঁধতে চান অলীক স্তন। দুটি ক্ষেত্রে কিন্তু সেই অ্যাপিয়্যারেন্স ও রিয়্যালিটির প্রশ্নটাই আসল ব্যাপার। একটা ভাঙলে আরেকটা কি যথাপূর্ব থাকে ?

সুবোধ-অতসী সম্পর্ক এ উপন্যাসের প্রধান বৃত্ত। চিত্রাসখী-বৃত্ত এ উপন্যাসে এসেছে সেই প্রধান বৃত্তের টানে। সুতরাং প্রথমে এই উপন্যাসের পারিবারিক বৃত্তটি ভাঙা গড়ার ব্যাখ্যা জেনে নিতে হয়। সুবোধবাবুর পারিবারিক প্যাটার্নে একটা আত্মসন্তুষ্টি ছিল। এই পারিবারিক প্যাটার্ন পুরোমাত্রায় ছোটো শহরের বুর্জোয়া পরিবার প্যাটার্ন। তার 'মেটিরিয়াল' স্তরের সঙ্গে তার 'স্পিরিট্যুয়াল' স্তরের কোনো ব্যবধানরেখা প্রথম নজরে পড়েনি। নজরে পড়ল অতসীর দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। হরিদাস এবং অতসী দেওঘরে সুবোধবাবুর ব্যক্তিত্বের বৃত্তের বাইরে গিয়ে যে যার নিজের মতো করে স্বাধীনতা পেল। দেওঘরের জীবনে অতসী একটা মুক্তির স্বাদ পান। 'খাবারের দোকানে দাঁড়িয়ে পেঁড়া খাবার পর অনুভব করলেন অতসীবালা যে, মনের দিক দিয়ে এত স্বাধীনতা দেওঘরে আসবার আগে কখনও পাননি।' 'বুঝেসুঝে চলবার প্রয়োজন নাই।' অতসীবালার দাম্পত্যজীবনে 'বুঝেসুঝে' শব্দটির গুরুত্ব খুব বেশি ছিল। এই স্বাধীনতা-হরণকারী শব্দ দুটিকে পরিচর্যা করেই অতসীবালার দিন কেটেছে। দেওঘরে 'রেখাকুঞ্জ'-এর বাড়িতে অতসীবালা চিত্রাসখী-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার কাছে স্বাধীনভাবে নিজেকে সঁপে দিলেন। জীবনে এই তাঁর প্রথম মনে হল, স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। পরাধীনতার মোহ থাকে—স্বাধীনতার মাদকতা। সেই মাদকতায় অতসীবালা আত্মবিস্মৃত হলেন।

অতসীবালার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার 'ধর্মমোহ'[৩] কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অতসীবালার ব্যাপারটা শুধু 'ধর্মমোহ' নয়, জীবন সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি। রেখাকুঞ্জে অতসীবালা নিজের স্বাধীনতা প্রথম উপলব্ধি করলেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে ইচ্ছা করে কিছু কখনও করে উঠতে পারেননি। কিছু নিজে নিজে করা যায়, নিজেকে যে নতুনভাবে আস্বাদন করা যায়—তাঁর সারাজীবনে এর আগে তা তিনি জানেননি। অন্য নারী হয়তো এ কথা জেনে নিত অপারিবারিক প্রেমের ভিতর দিয়ে। এবং সে তাঁর স্বাধীন প্রেমের কারণেই হয়ে

৩. 'সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' শ্রীগোপাল হালদারের লেখা বই থেকে বলছি। ৯৬ পৃষ্ঠায় 'দিগ্‌ভ্রান্ত' আলোচনাকালে লেখক কথাটি বলেছেন। 'মোহ' কথাটি ভবানীবাবুও পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন।

উঠত সংশ্লিষ্ট সকলের সমালোচনার বিষয়। অতসীবালা সেটা হলেন তাঁর ধর্ম-পথের জন্য। প্রেম, ধর্ম অথবা রাজনীতি যাই হোক না কেন, বিবাহিত নারীর স্বাধীন পদক্ষেপ যে পুরুষ-শাসিত সমাজে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—এটাই সতীনাথের দেখানোর বিষয়। এই দেখানো এই উপন্যাসে গবেষণাগারে পরীক্ষার মতো নির্মম অথচ জীবন্ত হয়েছে। তার একদিকের কারণ অবশ্য এই যে, সুবোধবাবুর যন্ত্রণা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের মতো তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হয়নি—হবার কথাও ছিল না। নিজের চাপা আত্মম্ভরিতা ও বেদনার মিশ্রণে তাঁর সমস্ত ব্যাপারটা হয়েছে অত্যন্ত বাস্তব। অত্যন্ত সাবয়ব তাঁর অস্তিত্ব।

অন্যদিকের কারণ অতসীবালা। কিন্তু অতসীবালার ব্যাপারটি একটু দুর্বোধ্য। অতসীবালা তাঁর দাম্পত্যজীবনে কী পাননি, আশ্রমের জীবনে তিনি কী পেলেন—সেটা উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। একটা বিষয় বোঝা গেল—অতসীবালা শক্ত মেরুদণ্ডের মেয়ে। যেটা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি—সুবোধবাবু পারেননি—এমনকী অতসীবালা নিজেও পারেননি, সেটা হল দরকার হলে তিনি কতটা যেতে পারেন। সহস্র সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত নারী-জীবন। প্রেমের অস্তিত্বগ্রাসী আকর্ষণেও এই সম্পর্কসূত্রগুলি সহজে ছিঁড়তে চায় না। অতসীবালা কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের মুহূর্তে একবারের জন্য পিছু ফিরে তাকাননি। অতসীবালারই মেয়ে যে মণি সে কথা বোঝা যায় মণির মধ্যে অতসীবালার ধাতুপ্রকৃতির বিদ্যমানতায়। সে কণ্ঠি ছিঁড়ে ফেলে পারিবারিক বিভেদের শক্তি-বিন্যাসে পিতার পাশে নিজের স্থান বেছে নেবার সিদ্ধান্ত যেদিন ঘোষণা করেছে, সেদিন থেকে আর পুন-র্বিবেচনা করেনি। মণির আচরণটা যেমন মোহ নয়, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত—অতসীবালার আশ্রম-জীবন-গ্রহণ কোনো মোহ নয়, সিদ্ধান্ত। তিনি একবারই জীবনে স্বাধীন আচরণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন—তাতে ব্যাঘাতের সম্ভাবনায় তিনি নির্মমভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন। সুশীল যদি তাঁর অনুগামী না হত তাহলে তিনি সুশীলকেও ত্যাগ করতেন, এ প্রমাণ কাহিনীতে দুর্লভ নয়। কাজেই এটাকে মোহ বলে আখ্যাত করা ঠিক হবে না। কিন্তু তা হলেও একথা জানতে ইচ্ছে করে—কী তিনি পেয়েছিলেন? অবশ্য আগের কথাটা সেক্ষেত্রে এই হয়, সুবোধবাবুর সংসারে কী তিনি পাননি। যখন দেখা যায় এই দুটোরই কোনো সদুত্তর নেই—তখন জানতে ইচ্ছে করে অতসীবালা কি শূন্যের বিনিময়ে শূন্য বেছে নিলেন? এ কি লেখকের দিক থেকে অতসীবালা-কল্পনার ত্রুটি, না, এটাই অতসীবালার নিয়তি!

নয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল যখন তখন বাংলাদেশ তার ঐতিহাসিক নির্মম নিয়তির মুখোমুখি হল। কলকাতা একদিকে যেমন ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই তার গণ-জাগরণের সংকল্পকে মূর্তি দিল এক অভূতপূর্ব সাধারণ ধর্মঘটে, অন্যদিকে ঠিক তার একপক্ষ পরেই সে এক ক্লেদাক্ত রক্তস্নানে নিজের ছিন্নমস্ত রূপকে তুলে ধরল ১৬ আগস্ট। ২৯ জুলাই বলে গেল 'আমরা ইচ্ছা করলে পারি'। ১৬ আগস্ট বলে দিল—'বাধা দেবার জন্য প্রতিক্রিয়াও তৈয়ার'। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই বুঝি বা ২৯ জুলাই ঘটে বলেই ১৬ আগস্ট গুঁড়ি মেরে শ্বাপদের মতো এগিয়ে আসে। নায়ককে হত্যার জন্য প্রতিনায়কের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়ে দুজনের কাছে আমরা সময়ের হৃৎস্পন্দন শুনতে পেয়েছি। একজন রমেশ সেন। আরেক জন অসীম রায়। এঁরা দুজনেই যোগ্যতায় কারও চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। দ্বান্দ্বিক সমগ্রতায় বিশ্ববীক্ষণ, সময়ের কাছে দায়িত্ব স্বীকার, সামাজিক সংস্থান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান এই দুই ঔপন্যাসিকেরই প্রভূত পার্থক্যের মধ্যেও সাধারণ সাদৃশ্য। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত রমেশচন্দ্র সেনের 'কুরপালা' তার ঘটনাকাল এবং রচনাকালের সম্বন্ধ সংযোগে একটা প্রতীকী তাৎপর্য পায়। কুরপালা গ্রামের জনজীবনের রূপান্তর কোন্ আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ছন্দে অন্বিত হয়েছিল তা বলতে হলে যে মননসিদ্ধ অথচ হৃদয়বান দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন ছিল রমেশবাবুর তা ছিল। অভাবি মানুষের লড়াইয়ের ছবিকে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পটভূমির বিপরীতে রেখে লেখক স্বকণ্ঠে যেন বাঁচার মন্ত্রকে সঞ্জীবিত রাখেন। কুরপালা গ্রামের জীবনপ্রকৃতির দ্বন্দ্বময় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় ভারত-বর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের একাংশ। আমরা কেউ এই উপন্যাসকে যে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিইনি, এ থেকে প্রমাণিত হয় আমাদের উপন্যাস সমালোচনা হয় বাজার প্রভাবিত, নয় নিশ্চেষ্ট গবেষণা তাড়িত। সম্প্রতি 'এবং এই সময়' (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পত্রিকা এই লেখক সম্বন্ধে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়।

অসীম রায়কে উপেক্ষা করা হয়েছে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিষয়গত দেউলিয়া যুগে। বিমল মিত্র বা অবধূত যখন ক্রেতাদখলের শিল্পজ্ঞানহীন অথচ চমকদার আয়োজনে পসরা সাজিয়েছেন, অসীম রায় সেই সময়ে 'একালের কথা' 'গোপালদেব' থেকে শুরু করে 'শব্দের খাঁচায়', 'দেশদ্রোহী', 'একদিন ট্রেনে',

'আবহমানকাল' প্রমুখ উপন্যাসে সময়সমাজের পটে ধৃত চলিষ্ণু ব্যক্তিপাত্রের বৌদ্ধিক সংকট, অস্তিত্বের যন্ত্রণা এবং জীবনকে সমগ্রে বুঝে নেবার তাগিদের অন্তর্গূঢ় কবিতা, গদ্যনাটক সৃষ্টি করে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিস্ময়কর ছিল তাঁর গদ্যশৈলী। বলা যেতে পারে তাঁর হীরকোজ্জ্বল গদ্য, যা তিনি গড়ে নিয়েছিলেন জীবনের অন্তর্গূঢ় কবিতা, চিন্তাস্রোতের উপল-সংঘাত-বিচিত্র গতিকে অনুধাবন করতে করতে, সে গদ্য ছিল এক হিসাবে তাঁর তীক্ষ্ণ নৈতিক অবধানতার দান—ব্যক্তিপাত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের অভিজ্ঞান। বিমল কর ছাড়া সমকালীন আর কোনো বাঙালি উপন্যাস লেখক এমন গদ্য গড়ে তোলেননি, যা একই সঙ্গে বিজ্ঞাপক, প্রভাবক, গূঢ় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এবং গতি তৎপর। এই দুই লেখকের যে কোনো একটি বাক্যের শব্দ-যোজনাও ছিল উপন্যাসের সমগ্র বাতাবরণের দান। এইভাবে অসীম রায় একালের নায়ক কল্পনায় এবং তার প্রমূর্তায়নে অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। তাঁর 'আবহমান কাল' বড়ো মাপের উপন্যাস। হয়তো তাঁর আত্মবীক্ষণও বটে। কিন্তু মননের দিক থেকে ঋজু এবং গভীরধর্মা এই লেখক জানতেন আত্ম-বীক্ষণ—যদি একালের মানুষের আত্মবীক্ষণ হয় তাহলে অবশ্যই তা বিশ্ববীক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছোটো মাপের, হয়তো বা তাঁর গৌণ রচনাই বলব 'নবাববাদী' এই বীক্ষণস্বাতন্ত্র্যে, ইতিহাস চেতনায় অনেক হাতে গরম সাহেব বিবি গোলামের কেচ্ছাকলমুখর সেই সময় অপেক্ষা সময়ের দিক থেকে পিছু হটেও ভাবনার দিক থেকে অগ্রবর্তী রচনা।

মনে পড়ে পাঁচের দশকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। নৈহাটি পূর্ব কাঁটালপাড়ায় পাশাপাশি পথ হাঁটছেন সমরেশ বসু আর অসীম রায়—অসীমের মুখে একটা বিলাতি কেতার পাইপ। সমরেশ ঢিলে হাতার ইস্তিরি-ভাঙা পাঞ্জাবি পরা, দুজনে উপন্যাস নিয়ে বাগবিতণ্ডায় মশগুল। একজনের প্রথম উপন্যাস 'একালের কথা' তখন বেরিয়েছে। আরেকজনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে এযুগের কাহিনী বর্ণিত হয়নি—সে বই 'উত্তরঙ্গ'। পাশাপাশি ওঁরা পথ চলছিলেন। আমাকে তেমন গ্রাহ্য তখনই তাঁরা করছিলেন না। কেননা, তখন আমার অবস্থাটা—'আমি কেহ নই আমি শুধু এক কবি'। তাঁরা দুজনে পাশাপাশি পথ হাঁটছিলেন বটে, কিন্তু সমান্তরাল রেখার পাশাপাশি পথ হাঁটা—সমান্তরাল রেখা কখনও মিলিত হয় না। একজনের হিসেবি বিশ্ববীক্ষা ও অন্যজনের বেহিসেবি জীবনজিজ্ঞাসা দূরে দূরেই থাকে। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'

জীবনের বিস্ময়কে ঘিরে শিল্পের নিরীক্ষা। যে পটভূমি, যে 'থিম', যে বাণীশৈলী এ উপন্যাসকে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তার মূলে রয়েছে জীবনের এক অবিনশ্বর দ্বান্দ্বিক রূপের উপলব্ধি। সীতারাম যশোবতী ও বৈজুনাথকে ঘিরে আমরা অবশ্যই নানা রূপক কল্পনা করতে পারি। বলতে পারি মৃত্যু এবং জিজীবিষার মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল চিরন্তনী মহাশক্তির কথা। বলতে পারি কালের কবলে ধৃত মানবীয় পিপাসার কথা। 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬২-তে। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয়েছে 'বিবর'। ছয়ের দশকের গোড়ার দিক। নকশাল আন্দোলনের দূরাগত মেঘবিদ্যুৎ তখন বিস্ফোরিত হতে চলেছে। 'অন্তর্জলী যাত্রা' এবং 'বিবর' দুটি লেখাতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৃথক পৃথক হিস্যায় জীবন আর মৃত্যুর আলো আর ছায়ার সহাবস্থিতি, কাটাকুটি। রূপ, পরিণাম এবং বহতা নদীর মতো অনন্ত জীবনকে কেন্দ্র করে কমলকুমার এক এমন জীবনসত্যের অবতারণা করেন যা বস্তুত কোনো তত্ত্বের দ্বারা স্পৃষ্ট নয়। জীবন কোনো সময়েই তা নয়। প্রাকৃত পৌরুষ যখন প্রেমে ডাক দেয় জীবনকে তখন সম্মুখে অবলুণ্ঠিত মুমূর্ষু প্রাণও বারেকের জন্য মুঞ্জরিত হতে চায়। এও তো তত্ত্বকথাই হল। কিন্তু কমলকুমার এমন করে একথা বলেননি। তিনি সমগ্র গল্পটি আমাদের শুনিয়েছেন গল্পের নিয়মে। সে নিয়মে তাঁর বিচিত্র, বিশিষ্ট — একান্ত ব্যক্তিগত বাগ্‌ভঙ্গিও হয়ে যায় পটভূমিকারই অংশ। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বাগ্‌ভঙ্গির সার্থকতা 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বাইরে কতখানি, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই যে ওই বাগ্‌ভঙ্গিতে বলাটা এখানে, এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে কতটা অনিবার্য ছিল। এবং আরও বলার কথা আঙ্গিকরীতি এখানে বিষয়ের বেশ নয়, বিষয়টাই এখানে হয়েছে আঙ্গিকরীতি। এই গদ্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে এ কাহিনী বলতে গেলে তা হয়ে যেত নেতিয়ে পড়া একটা বাসি কাহিনী। অথচ এই আঙ্গিকে এই পাত্রপাত্রীবিন্যাসে, এই প্রাকৃতিক পটে কথিত কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় এ কাহিনী এতদিন বলা হয়নি কেন! যশোবতীকে কেন্দ্র করে জীবন এবং মৃত্যুর যে নাটক ওই প্রাকৃতিক পটে মূর্ত হল, তা আবহমান কালের ভারতীয় জীবনকথা। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরে একটা কথা বলে এসেছে, মৃত্যু গৃহীতা কেশেষু ইব। সেই মরণাহত জিজীবিষা কোন্ মহাশক্তির লীলারূপকে ফুটে উঠতে চায় — কেমন করে তা কাব্য নাটক কথা ও চিত্রের সমাহারে পেয়ে যায় একটা ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যের সংহতি 'অন্তর্জলী যাত্রা' তারই প্রমাণ। আমরা যারা শিল্পকে জানতে চেয়েছি জীবনের তাগিদে, আমরা যারা শিল্পের আলো ফেলে জীবনকে বুঝে নিতে

চেয়েছি তত্ত্ব হিসেবে নয়, জীবন হিসাবেই—আমরা যারা জীবনে যে সমস্যাকে অনুভব করি বলেই সেই 'কনটেণ্ট'কে ঠিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য 'ফর্ম'কে প্রশ্রয় দিই, এবং সেই ফর্মই তখন যাদের কাছে বিষয়ের নামান্তর বা বিকল্প হয়ে ওঠে, তাদের কাছে কমলকুমার মজুমদার নিয়ে এলেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসা। এই প্রজ্ঞাসিদ্ধ লেখক বেদনাবিদ্ধ হয়েও এক বেদনোত্তর অপার প্রশান্তিকে চিনে নিতে পারেন জীবনের উপর গভীর বিশ্বাসে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে গদ্যকাঠামো স্থির করে দিয়ে গেছেন, আমরা তাতেই অভ্যস্ত বলে হয়তো কমলকুমারের গদ্য-রীতি প্রথম প্রথম আমাদের কাছে কিছুটা অস্বস্তিকর লাগে। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা ভাবার আছে। এক. বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিতে বিদ্যাসাগরের যুগের স্থায়িত্বসাধক বাঙালি মধ্যবিত্তের স্থায়িত্বসাধনার ছায়া। যে কালখণ্ডকে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় ধরতে চেয়েছেন, সে কালখণ্ডে ছিল একটা অস্থিরতা—নিরুদ্দেশ নিরালম্ব এক সন্ধিক্ষণ। বলি-অঙ্কিত, জরালাঞ্ছিত স্থবিরতা এবং সম্ভাবনাময় যৌবন, নদী এবং শ্মশান নিশ্চয় একত্রে এক বিচিত্র গুরুচণ্ডালী। এই অস্থির গুরুচণ্ডালীর বাস্তবতা স্থির গদ্যে প্রতিমায়িত হতে পারত না। কমলকুমারের গদ্যের চিত্রল পারম্পর্যের মূলকথা—(যা সব থেকে শিল্পসার্থক হয়েছে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য়) ব্যাখ্যেয় বাস্তবতার যন্ত্রণাকে প্রতিমায়িত করা। এখানে কমলকুমার অভিনব এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সূত্রেই বলি যে সতীদাহ-প্রসঙ্গ ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মধু সাধু খাঁ' কাহিনীতে সতীদাহ প্রসঙ্গ তুলনীয় নয়, তুলনীয় হতে পারে না। কিন্তু 'মধু সাধু খাঁ'তেও বহতা নদী 'অন্তর্জলী যাত্রা'র মতো একটা বাতাবরণ তৈরি করে যার ফলে বাস্তবের প্রতিমায়ন এখানেও বিচিত্র হয়ে ওঠে। 'গল্প কি শ্রোতার? ছাই, গল্প যে বলে তারই সুখ'—সেই সুখে অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে প্রতিমায়িত। 'মধু সাধু খাঁ' থেকে একটু বলি : 'নদী স্রোতের এক কৌতুক আছে—সর্বত্রই জল, জলই তো, আর একটানা গতিও, কিন্তু অবিরত বদলাচ্ছে যেন; ছোটো ছোটো পাক, ছোটো দুচারটে ঢেউ, অন্য কোথাও সাপের পিঠের মতো পিছলে যাওয়া বা।' এই প্রতিমায়নে অথবা অন্য কোথাও মদুর গলার স্বর ভাষার ভঙ্গি, ভাবনার ছাঁদ ধরে দেওয়া হয়েছে এইভাবে—'অনেক রকমের আকাশ দেখা আছে মদুর সকালের। টুপ করে আলো নেবার পর যে-অন্ধকার; তারপর নানা দিন নানা রঙের আকাশ হয়। লালে সোনালিতে মাখামাখি হয়; কখন যেন একবার লালে সবুজে মেশামেশি ছিল। গন্নার মতে তা ঝড়ের কারণ। এখন ঝড় ওঠা কিছু অসম্ভবও নয়। তাও ভয়ের। আবার এমন হয় শেষ রাতের

চাঁদ ডুবতে ডুবতে না অন্ধকার। মেঘের ছায়ায় জল কালো। আর তার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে বেরঙা আলো ফোটে। অবশেষে জলের মধ্যে স্রোতে পাকে ভাঙা-ভাঙা বিবি সাহেবের মুখের মতো সফেদ ঠাণ্ডা ঝিকিমিকি সূর্য দেখতে পাওয়া যায়।' আলো এবং জলের দ্বৈতে ফুটে ওঠে বারে বারে এক অবিনশ্বর মোটিফ। কমলকুমার এবং অমিয়ভূষণের তুলনা করতে গিয়ে 'মধু সাধু খাঁ : একটি দৃশ্যকাব্য' নামক রচনায় ধীমান দাশগুপ্ত বলেন—কমলকুমারের 'ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের, কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের—যে বাঙালিয়ানার সঙ্গে হয়তো অমিয়ভূষণের মিলবে না, তবু দুজনের মধ্যে এক ধরনের মিল রয়েইছে। মেজাজের তন্ময়তায়। অমিয়ভূষণ ক্লাসিক, কমলকুমার মিষ্টিক। একজনের সহজাত বলিষ্ঠতা, অন্যজনের তান্ত্রিক বলিষ্ঠতা। একজনের আপাত জটিল অন্বয়, অন্যজনের আপাত অবোধ্য আচার। কমলকুমারে লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার, অমিয়ভূষণে উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার।' এই উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে হয়তো আমরা যুক্ত করতে চাইব আর দুটো কথা। অমিয়ভূষণ জীবনের প্রতিমায়ন অপেক্ষা ভাবায়নের বেশি পক্ষপাতী। তিনি সেই দিক থেকেই জীবনকে খোঁজেন স্বরূপে। কমলকুমার জীবনের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়তে চান। রূপকে তিনি অরূপে অধিষ্ঠিত করতে পারলে সুখী হন। অমিয়ভূষণের দ্বন্দ্বজ্ঞান 'গড় শ্রীখণ্ড' থেকে 'রাজনগর' পর্যন্ত বিস্তারিত। তবু মনে হয় তিনি স্বস্তি পান এই 'মধু সাধু খাঁ'র মতো রচনায়। অন্যদিকে কমলকুমারের মহাশক্তির লীলাজ্ঞান তাঁকে নিয়ে আসে মহাজীবনের উপকূলে। অমিয়ভূষণের 'মধু সাধু খাঁ'য় আলোর কত ভূমিকা, আলোর কত রঙ—'শেয়ালি রঙের আলো' এই কাহিনীতে আমরা প্রথম শুনলাম। তা কেবল কবিত্ব নয়, এ জাতীয় চিত্রকল্পে বলবার কথাটি যথাযথ ভূমিকা পায়। তবু আলো আর জলের এত মিতালি সত্ত্বেও অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা এখানে শেষ পর্যন্ত মধু সাধু খাঁয় অন্ধকারেই প্রতিমায়িত। পক্ষান্তরে যেন এক বৈতরণী সৈকতকল্প অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েও 'অন্তর্জলী যাত্রা'তে আলোর অভিমুখিনতা অপ্রতিরোধ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস প্রয়াসে 'অন্তর্জলী যাত্রা' এজন্য এক অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ।

অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই একটা বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করি—বিষয়টি হল বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে কবির লেখনীজাত উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসুর কথা এখানে উঠতে পারেই—কিন্তু তার থেকে বেশি উঠতে পারে কবির কলমে লেখা সেইসব গদ্যরচনা যা পরোক্ষে এবং তির্যকভাবে রচয়িতা কবিদের অন্তরজগতের উন্মোচন। সজনীকান্তের 'অজয়', জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান'

(সুতীর্থ অথবা জলপাইহাটি) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কুয়োতলা' অথবা মনে করতে পারি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সাম্প্রতিকতম জয় গোস্বামীর পদ্যোপন্যাস। এই রচনাগুলি আর যা বলে বলুক, অন্তত একটা কথা এরা বলে—উপন্যাসের 'ফর্ম' এবং 'ফ্রেম'এর, তথা তার আঙ্গিক বাচনিক পরিধিকে ধরাবাঁধা সংজ্ঞার্থে বেঁধে রাখা যায়। ক্রমশই এই শাখাটি এমন পরিপুষ্টি লাভ করছে যে অচিরে এমন একটা সময় আসবে যে একে বাদ দিয়ে বাংলা উপন্যাস আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না।

সময়ের সওয়ার বাংলা উপন্যাস। সওয়ার কখনও কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বল্‌গা হারিয়ে ফেলে দিগ্‌বিদিকের মোহে। কখনও সে মনে করে পাংশুরীতিচর্চায় বুঝি বা মুক্তি। কখনও বা বাস্তবের বহ্নিজ্বালার মুখোমুখি হতে ভয় খেয়ে আত্ম-সমর্পণ করে বসে উনবিংশ শতাব্দীর কেচ্ছাকাহিনীতে অথবা অলীক বিধুরতায়। কখনও বা অচেনা দিগন্তের অরণ্যপাহাড়ের হাতছানিতে সে সঁপে দেয় তার জিজ্ঞাসার সততা। এদিকে কলকাতায় বিড়ম্বিত, আশাহত, স্বপ্নহত বর্তমানে প্রাণের উল্লাস এবং অস্তিত্বের জিগীষা ধূলিদলিত। তাই বুঝি সেই শতধা মুকুরে নিজেরই বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখায় তার রুচি সায় দেয় না! তাই কি তার এই কালচক্রে অতীত বিহার, অথবা দৈগন্তিক বিস্তারের দিকে ঝোঁক! মার্কেট ওরিয়েণ্টেড হবার দিকে প্রবণতাও তার অতঃপর বেড়েছে। উপন্যাস এতাবৎ লভ্যাংশ প্রদায়ী পণ্য ছিল না। এবারে তার এক প্রবলাংশে সে ঝোঁক দেখা দিল। কমলকুমার, অমিয়ভূষণ, দেবেশ রায়, বিমল কর তথাপি এই বাণিজ্যিকতার মধ্যেও কম্পাসের কাঁটাকে অস্থির হতে দেননি।

পাঁচের ছয়ের দশকে বিমল কর আপন অন্তর্লীনতায় যে স্বধর্মাশ্রয়কে প্রাধান্য দিলেন তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এবং আছে যে সেটাই বড়ো কথা নয়, আসল কথাটা হল এ ব্যাপারে তিনি একক। 'ছোট ঘর', 'ছোট মন' এবং 'খোলা জানলা'য় বিমল কর একদা কলকাতার পর্বান্তরের ঢেউ এবং আবর্তে স্পৃষ্ট জীবনকে তাঁর বক্তব্যের আলম্বন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিকে তিনি খুঁজতে চাইলেন ব্যক্তির গহনে। কাহিনীকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। ঘটনাঘন নয় তাঁর উপন্যাস। বলতে কী 'দেওয়াল'-এর পর তিনি বড়ো মাপের—আমি আয়তনের দিক থেকে বলছি—লেখা বিশেষ লেখেননি। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই নভেলেট—ক্ষুদ্রোপন্যাস। কিন্তু ভিতরের মাপের মাপকাঠি কোথায় মিলবে? যখন সমস্ত বাস্তব বহির্জগতে ধোঁয়াশা ধূসরতা চেনাচিনিকে দুষ্কর এবং জটিল

করে তুলেছিল, যখন ছিন্নভিন্ন ঐকতান সকল দিকে, যখন উত্তর-স্বাধীনতা স্বপ্ন নানাদিক থেকে প্রহৃত, তখন মৃত্যুচেতনা, ক্লান্তি কেবল ব্যাধিজনিত আধি নয়। কথাটা পাড়লাম, বিমল কর তাঁর সাহিত্যজীবন প্রসঙ্গে শরীরী সংকটের কথা তুলেছেন বলে। সে শরীরীসংকট ঘটনা বটে, কিন্তু দেশকালের অন্বয়ে তা তাঁর জীবনেতিহাসে প্রতীকী হয়ে উঠল। যে গাঢ় অনিশ্চয়তা বাইরে থেকে ব্যক্তিকে গ্রাস করছিল, তা বিমলবাবুর প্রধান কতকগুলি রচনায় মৃত্যুমাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। 'খড়কুটো' বিমলবাবুর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। ভ্রমরের নিয়তি এবং প্রেমের বিপরীত সহাবস্থানে এই কাহিনী আজকের মানুষের আর্ত অথচ অপরাজেয় সত্তার উপন্যাসসম্ভব প্রতিমায়ন। উপন্যাসটি মর্বিড হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ভ্রমরের ব্যাধি নয়, তার মহাশক্তি তা হতে দেয়নি। ভ্রমর কি অমলকে বাঁচিয়ে দিতে পারে বস্তুজগতের সমস্ত অসংগতি থেকে? অমল কি পারে ভ্রমরকে পূর্ণগ্রাস থেকে বাঁচাতে? প্রত্যক্ষের সমস্ত প্রকার চড়া রং থেকে দূরে থেকেও 'খড়কুটো' আমাদের সময়ের গল্প—আমাদের বিশ্বাস সংশয় আর্তির ও বেদনার গল্প। তা সবের মাঝখানে নিজের অক্ষয় অভিজ্ঞান খোঁজার গল্প। বিমল কর আত্মস্থ এবং নির্লিপ্ত শিল্পী। কিন্তু বাস্তবের মার এড়িয়ে একজন সৎ শিল্পী চলতে পারেন না। তাই তাঁকে লিখতে হয় 'যদুবংশ'। কিন্তু 'যদুবংশ' বা 'অসময়'এ বিমল কর যে দায়িত্ববোধের প্রমাণ দিন না কেন, তাঁর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে 'পূর্ণ অপূর্ণ'। এই উপন্যাসটির মূল বক্তব্যে আবার আমাদের সময়ের ছাপ পড়ে। সে ছাপ লেখক ধরেন তাঁর নিজস্ব রীতিতে। বিমল কর বড়ো শিল্পী। তাঁর পট-রং-ল্যাণ্ড-স্কেপ ও পোর্ট্রেট সবকিছুতেই পড়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। অপূর্ণতায় আমাদের বাসা, অপূর্ণতায় আমাদের চলাচল। কিন্তু পূর্ণতার ঠিকানা খুঁজে ফিরি আমরা সেই অপূর্ণতার মাঝে। গল্পে নেই চমক, চরিত্রগুলি কোনো সময়ে উচ্ছভাষ নয়। মৃদু নিচু গলায় তারা কথা বলে। তাদের প্রেমে নেই দাহ—দীপ্তি মোমের আলোর মতো নিরুত্তেজ। হৈমন্তী এবং সুরেশ্বর প্রেমে এবং জীবনব্রতে কে কী কেমনভাবে খুঁজেছিল? প্রেমের ধরন কী আমরা যেমন জেনে এসেছি শুধু তেমনই, না কি তার অন্য ধরনও থাকতে পারে? প্রেমের রূপ, স্বরূপ, তার ব্যক্ত মাত্রা এবং নিহিত মাত্রা জীবনের একটা বড়ো ধরনের আত্মনিবেদনের সঙ্গে যুক্ত হলে কী হয়, এটাই ছিল হৈমন্তীর প্রেমের রহস্য। 'খড়কুটো'তেও যেমন 'পূর্ণ অপূর্ণ'তেও তেমন বিমল কর এক শাস্ত্রধর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সে আধ্যাত্মিকতা মানবজৈবনিক বলেই তা নমস্য। বিমল করের

চরিত্রেরা আমাদের খুব চেনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা অচেনার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। ঘটনা দিয়ে তারা চিহ্নিত নয়। তারা যে রাস্তায় হাঁটে সে রাস্তায় লোক কম। অথচ বুদ্ধদেব বসুর নায়কদের মতো তারা পাংশু নয়। শৌখিন নয় তাদের নির্জনতা। যে সামান্য ঘটনার কাছে লেখক তাদের সম্প্রদান করেন, সে সামান্য ঘটনা সহযোগেই তারা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এইখানে তাদের অন্তর্জীবনের গূঢ়তায় দ্বিতীয় জন্ম। এই দ্বিতীয় জন্মলাভ বিমল করের প্রতিটি রচনার মূল কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কলকাতার নাগরিক জীবনের স্বভূমিতে স্থির থেকে যাঁরা মধ্যবিত্ত-মূল্যবোধের ধস নামাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'চেনামহল'-এর নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কিনু গোয়ালার গলি' ও 'মুখের রেখা'র সন্তোষকুমার ঘোষ এবং 'মীরার দুপুর' ও 'বারো ঘর এক উঠানে'র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথা। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আপন এককত্বে একেবারেই অনন্য। যে ধস নামার কথা বলছি তা দেখতে হলে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকার ক্ষমতা প্রয়োজন; তা এঁর ছিল। হয়তো এজন্যই তিনি সুখপাঠ্য তালিকায় কদাচ ঠাঁই পাননি। আলাদা করে মনে পড়ে এঁর এই তার পুরস্কার। এক কবি. এবং একটি কবিতাপত্র একটি রেস্তোরাঁ এবং সংলগ্ন বিচিত্র চরিত্র মানুষগুলিকে ঘিরে যেন সত্যসত্যই জানা-শোনা কলকাতা শহরের একটি যুবক-অধ্যায় এই উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। সুনীলের আত্মপ্রকাশ ও শীর্ষেন্দুর পারাপারে যে যুবক বিক্ষোভ তা থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের আলোচ্য উপন্যাস এক অন্যতর মাত্রা নিয়ে এসেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেক যুগের একটা বেদনা থাকে। প্রকৃত লেখক সেই বেদনার রক্তাক্ত স্বরূপকে উন্মোচিত করেন। জ্যোতিরিন্দ্র এক শান্ত অন্তর্ভেদী গদ্যে একাধিক উপন্যাসে সে কাজ করেছেন।

কিন্তু বাস্তব জগতের বাইরের ঢেউ এবং আবর্তের টানকেও তো উপেক্ষা করা যায় না। সমরেশ বসু তাঁর বিখ্যাত বিতর্কবহ্নিকুণ্ড 'বিবর'এ বর্তমান শতাব্দীর অপরাহ্নের এক রক্তাভ ছবি ধরে দিলেন। যে সময়ে 'বিবর' লেখা হয়েছে, সেই সময়েই—কিছু আগুপিছু সত্ত্বেও চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল গ্রুপগুলি সংগঠিত হল। আমি এই আন্দোলনের নৈতিক বা তাত্ত্বিক কোনো অংশীদার নই। তথাপি একটা কথা বুঝি, এ আন্দোলন ছিল বহু অনুত্তর পুঞ্জীভূত প্রশ্নের, মধ্যবিত্ত শতকীয় ঐতিহ্যের বহু অমীমাংসার বিস্ফোরক পরিণাম। যে মূর্তি ভাঙচুর অতঃপর শুরু হল তা আমাদের যুবসমাজের কাছে অনেক মিথ্যাখতের অনিবার্য

প্রতিক্রিয়া। মূর্তি ভাঙাভাঙি শুরু হয়েছে বাইরে। 'বিবর' উপন্যাসে সমরেশ ভিতরের মূর্তিটাকে ভাঙতে আরম্ভ করলেন তার আগেই। এ বড়ো করুণ কাল-বেলা—যখন শত বৎসরের লালিত সমস্ত পূজাবেদি থেকে সহসা প্রতিমা ও বিগ্রহ বিসর্জনের আহ্বান এসেছে। সে আহ্বান ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে বিচার আলাদা কাঠগড়ায় হবে। এখানে বলার কথা সে আহ্বানের পিছনে যে ক্ষোভটা ছিল তা অকৃত্রিম।

আমাদের সময়ে একই সঙ্গে প্রায় সমান মাপে প্রত্যাখ্যাত ও বৃত, ধিক্কৃত ও শংসিত লেখক একজনই, তিনি সমরেশ বসু। মৃত্যু তাঁকে মহানেপথ্যে ডেকে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু আজই বোধ হয় তিনি আরূঢ় বিতর্কের সর্বোচ্চ চূড়ায়। এ থেকে বোঝা যায়, জীবনে এবং শিল্পে—কোনোক্ষেত্রেই তিনি 'ভালো', কেবল-মাত্র 'ভালো', এই অভিধার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না। বরঞ্চ 'ভালো', এই অভিধার প্রতি তাঁর ছিল এক আকৈশোর উপেক্ষা। উপেক্ষার তথ্যভিত্তিক কারণগুলির জন্য তল্লাশি চালাবেন তাঁর জীবনী-লেখকেরা। কিন্তু একটা সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। কথিত উপেক্ষার মধ্যেই ছিল তাঁর অভিজ্ঞানভিক্ষু মনঃসংকটের প্রাথমিক বীজ। সে বীজ পরে স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল—তা এগিয়ে চলছিল মহীরুহ হবার দিকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোয় মন্দে মিশিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের প্রতীকপুরুষ। তাঁকে ভালো না বাসলেও আমাদের এই কথাই বলতে হবে।

সমরেশের নিজের জীবনে, আতপুর জগদ্দলের সামাজিক জীবনে যে সমস্যা বাস্তব আকারে দেখা দিয়েছিল, যে অভিজ্ঞতা তাঁর ঘরে বাইরে ছিল মূর্তিমান, তিনি যখন লিখতে বসলেন, তখন সেই সব সমস্যাই শিল্পের সমস্যা হয়ে তাঁর কাছে দেখা দিল। যে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন তিনি সমাজ ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে, শিল্পে সেটাই দেখা দিল শৈল্পিক সমস্যারূপে। সেজন্য সমরেশ বসুকে বিচার করতে হবে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট সমস্যার দিকে লক্ষ রেখে। পুরাতন প্রথাগত মাপকাঠিতে এই লেখকের রচনার চৌহদ্দি মাপা যাবে হয়তো, কিন্তু লেখকের শিল্পের সমস্যা ও জীবনের সমস্যা সেই বিচিত্র জীবনে কী আকৃতি ধারণ করেছে, তার হদিস মিলবে না।

সমরেশ বসুর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে প্রত্যক্ষ হয়েছে একটা বড়ো ব্যাপার। মানুষ-সমাজ-প্রকৃতির পরস্পর সম্মুখীনতা সেসব উপন্যাসে লেখককে আকর্ষণ করেছে অধিকতর। তাঁর 'উত্তরঙ্গ' থেকে 'টানাপোড়েন' পর্যন্ত এ জাতীয়

উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ও সংঘর্ষের আলেখ্য প্রধান হয়ে উঠেছে। তিনি ব্যক্তির স্বরূপ-শ্রেণীরূপ-শাশ্বতরূপের অন্বয় খুঁজে ফিরছিলেন সেদিন। তাই এ প্রকরণের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে—ধরা যাক 'বিবর' থেকে তাঁর অণুবীক্ষণ-মুখ্য মনোভাব প্রবলতা পেয়েছে। তখন থেকেই তাঁর রচনায়—তাঁর ন্যারেশনে অতীতচারণ আবশ্যিক হয়ে উঠতে চাইল। তৃতীয় পর্যায়ে এই লক্ষণ আরও বেশি প্রগাঢ় হয়েছে। 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'তিনপুরুষ', 'দশদিন পরে' অথবা 'খণ্ডিতা'য় অতীতচারণ ন্যারেশনের দিক থেকে জরুরি ছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমরা বলতে চাইছি, এই পর্যায়ে সমরেশ প্রত্যক্ষ কাহিনী বর্ণনা একেবারে বাদ দিয়েছেন। আমাদের বলার কথাটি হল এই যে, মনোময় মানুষ, আত্মসমীক্ষক মানুষ, নিজের কাছে নিজেরই হিসাব-নিকাশের জন্য উদ্বিগ্ন মানুষ যেদিন থেকে সমরেশের উপন্যাসে সুতীক্ষ্ণ পরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠল, সেদিন থেকেই স্মৃতি-প্রবাহ, অন্তর্ময় গূঢ় জগৎ তাঁর লেখাতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। সঠিক সাল-তারিখ দিতে পারব না। তবে মনে করি 'স্বীকারোক্তি' গল্প থেকেই এই প্রসঙ্গ প্রকরণ তাঁর কাছে অনিবার্য হয়েছে। কিন্তু এখানেও তিনি আটকে থাকলেন না। তৃতীয় পর্যায় যখন তিনি চুকিয়ে দিয়ে চতুর্থ পর্যায়ের মহৎ সূচনা করছেন—হাতে নিয়েছেন রামকিঙ্কর, তখন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ লড়াইটা আবার তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে।

সমরেশ বসুর সংকটকেও কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সংকট বা মোটিভ থেকে দেখলে সঠিক দেখা হয় না। কথাটা বর্তমান নিবন্ধ-লেখক আরেকটু দূরে নিয়ে যেতে চান। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস। সমরেশ বসুর এই উপন্যাসটি প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এ জাতীয় উপন্যাসের কাজই কিন্তু বিতর্ক সৃষ্টি করা। দলীয় মতবাদী উপন্যাসের কথা বলছি না। বাংলা সাহিত্যে এমন কোনো রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম কেউ করতে পারেন, যা পক্ষে বিপক্ষে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করেনি? এবং সে বিতর্ক আজও সমান জোরদার থাকেনি? 'চার অধ্যায়'এর কথাটিই বা এখানে মনে করা যাবে না কেন? এই জাগিয়ে তোলা বিতর্কই এ জাতীয় উপন্যাসের সার্থকতার মাপকাঠি।

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। কথাটা 'চার অধ্যায়' দিয়েই বলি, 'মহাকালের রথের ঘোড়া' প্রসঙ্গে এটা প্রযোজ্য হবে কি না সমালোচকেরা সে কথা বিবেচনা করবেন। 'চার অধ্যায়'এ রবীন্দ্রনাথের একটা সীমাবদ্ধতা ধরা

পড়েছে। কিন্তু তা যেমন রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা, তেমনি কি চরমপন্থী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও নয়? অর্থাৎ আমার বলবার কথাটি এই, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা ভেঙে যেতে পারত, যদি আন্দোলনটি তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতাকে ঘুচিয়ে বৈপ্লবিক অভিপ্রায়কে পূর্ণ মূর্তি দিতে পারত। এরকম যে ঘটে, তার একটা উদাহরণ আমি দেব। চুঁচুড়া মহসীন কলেজে তারাশঙ্কর-সংবর্ধনার প্রাক্‌কালে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় ব্যক্তিগত আলাপনের সুযোগ ঘটেছিল। আমি কথায় কথায় তারাশঙ্করের কাছে 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসটির কথা তুলেছিলাম। স্মিতগর্বে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, লোকে বোধহয় আমায় নকশাল বলবে। আমার কাছে কোনো টেপরেকর্ড নেই, লিখিত কোনো লিপিও নেই। কিন্তু আমি কথাটা ভুলতে পারছি না। সাঁওতাল বিদ্রোহের বিষয়টির মধ্যে ছিল শিল্পীরও মুক্তির অবকাশ। আমাদের এ কথায় কিন্তু বলবার বিষয়টা এই নয় যে, তারাশঙ্করের সাঁওতাল বিদ্রোহ বিচার আর সমরেশ বসুর নকশাল আন্দোলন বিচার কোনো দিক থেকেই তুলনীয়। উলটোটাই সত্য। তারাশঙ্কর বোঝেননি আবেগ দিয়ে কোনো ঐতিহাসিক সংগ্রামকে চিনে নেওয়া যায় না। সমরেশ বোঝেননি কোনো শ্রেণীর লড়াই নিয়ে—সে লড়াইয়ের ব্যর্থতা নিয়ে, উপন্যাসের পরিকল্পনা করতে গেলে তার দলের ট্রাজিক কর্মোদ্দীপনাকে পটভূমিগত মর্যাদা দিতেই হয়। এটা সমরেশ বসুর দেবারই কথা। কেননা বাংলা সাহিত্যে তিনি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে আছেন, তা হল একগুচ্ছ নায়ক-পরিকল্পনা, যারা নির্বিকল্প প্রভুত্বকে মানেনি, যারা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে পরিবেশ-নিয়তি এবং সামাজিক-নিয়তি দুয়েরই বিরুদ্ধে। আমাদের সাহিত্য আলোচনাক্ষেত্রে সমরেশ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ লেখক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'উত্তরঙ্গ' থেকে 'গঙ্গা' পর্যন্ত সমরেশ বসুর উপন্যাসের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে 'বিবর'-এর বাস্তবগত গূঢ় সত্যকে তিনি ধরতে চেয়েছেন।

অবশ্যই সীমাবদ্ধতা ছিল সমরেশের। কিন্তু সে সীমাবদ্ধতা কেবল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষবর্তী পর্যায়েই প্রকট হয়েছে এমন নয়—ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন স্তরে তা তাঁর প্রারম্ভিক পর্যায়েও দেখা দিয়েছিল, আর তা সবথেকে সংকটমূর্তি ধরেছিল তাঁর সন্ধিপর্বের উপন্যাস—'ত্রিধারা'য়। সংকটের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বেরিয়ে আবার রাস্তা খুঁজলেন 'দুই অরণ্য'তে। তখন থেকে আধুনিক অস্তিত্বের জটিলতা তাঁকে ডাকতে শুরু করেছে গহনের দিকে। ক্রমশই তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছিলেন। সে বিতর্ক আসলে তাঁর নিজের সঙ্গে। বিতর্কটা

দেখা দিল মূল্যমান নিয়ে, দেখা দিল ভূমিকা নিয়ে। প্রোটাগনিস্টের ভূমিকা-সংকট বা ভূমিকা-সংশয় সমরেশের লেখা উপন্যাসে বরাবর—সেই একেবারে প্রথম থেকে প্রাধান্য পেয়েছিল। বলা বাহুল্য সে সংকট বা সংশয় সবসময়ে একটা লড়াইয়ের রূপ নেয়। কখনও লড়াইটা ভিতরে। কখনও লড়াইটা বাইরে। সমরেশের দুই পর্বের উপন্যাসে এই লড়াই দুই মাত্রা পেয়েছে। 'উত্তরঙ্গ', 'সওদাগর'-এ তা একরকম নয়, কিন্তু একগোত্রের। 'বিবর' থেকে তা ভিন্নগোত্রীয়। তৃতীয় পর্বেও—'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'তিনপুরুষ'. 'খণ্ডিতা'তেও লড়াইটা আছেই।

সমরেশ শেষদিকে যেসব উপন্যাস লিখেছেন, তার নায়কেরা প্রবলভাবে সমীক্ষাশীল। প্রাসঙ্গিক হবে এখানে 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসটি। ড. সিকদার তাঁর গ্রন্থে এই রচনাটির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নাওয়ালের নিজেকে চিনে নেবার লড়াই কীভাবে কোন্ ঘাট পেরিয়েছে। কিন্তু এই বইটিই কি প্রমাণ করে না—নাওয়াল হারানো সত্তার দুর্বোধ্যতায় অস্পষ্ট হয়ে গেল না। সে অনেক ভুল বুঝে, ভুল করেও পথ ছাড়েনি। তা নইলে তার জীবনসমীক্ষায় নদীর রূপক প্রাধান্য পাবে কেন। যে চূড়ান্ত প্রত্যয়ে সকল দিক থেকে ঘা খাওয়া নাওয়াল পুনরায় স্মরণ করে ভবনাথের উক্তি—'বস্তুবাদীই এ কথা জানে, জড়পদার্থে চেতনা কাজ করছে। ইতিহাস এভাবেই বদলায়। প্রবল বহতায় নতুন স্রোত আনতে পারে'—সে কি ইতিহাসের অগ্রগতিকে অস্বীকার করছে! নাওয়ালের অভিজ্ঞতা যদি মিথ্যা হয়, তবে এই উপন্যাসের শিল্পরূপও ব্যর্থ। কিন্তু সে কথা কি বলা যাবে সহজে? এই পর্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপন্যাসে, 'বিবর' পর্যায়ে সমরেশ দেখিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত জীবন কত বন্ধ্যাদশাগ্রস্ত। 'বিবর'-পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তিনি সে জট থেকে মুক্ত হলেন। সুতরাং এ পর্যন্ত আমরা সমরেশের ঔপন্যাসিক জীবনের তিন পর্ব পেলাম। প্রথম পর্বে তিনি বললেন সেই সব মানুষের কথা, যারা ভাবেনি নিয়তি অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয় পর্বে তিনি ধরলেন সেই শ্রেণীকে, যে শ্রেণীর কাছে আর আশা করার কিছু নেই। তৃতীয় পর্বে তিনি এসে দাঁড়ালেন ব্যক্তির আত্মবীক্ষণে। রাজনৈতিক বিতণ্ডা উঠেছে তাঁর এই পর্যায় নিয়ে। এই তিন পর্বের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পর্বে দেখা যায় সমরেশ বারে বারে তাঁর মুখ্যপাত্রকে মৃত্যুর মুখোমুখি করিয়ে জীবনকে বুঝে নেবার পথে এগিয়ে দিয়েছেন। 'ইনূটেন্‌স্ লিভিং'-এর একটা শর্ত বুঝি 'কনফ্রন্টেশন উইথ ডেথ'—অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের এ কথার সায়

মেলে সমরেশের উপন্যাসে। কিন্তু তিনি তো এরপরেও চলছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত মহৎ রচনা তার সাক্ষ্য বহন করবে। মৃত্যু নয়, জীবনের চলিষ্ণুতায় তিনি জীবনকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে তিনি আমাদের বলতে চেয়েছেন, 'দেখ, তোমাদের ভুল কোথায় হয়েছে।' আমরাও তাঁকে বলতে পারি, 'দেখ তোমার ভুল কোথায় হয়েছে। কেন তুমি লেখকীয় নীরবতা ভেঙে উপন্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়েছ?' বলতে তো পারিই। তবেই তো লেখক ও সহৃদয় সামাজিকের মধ্যে মানসিক সেতুবন্ধন বা কম্যুনিকেশন্ আধুনিক মাত্রা পাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তিনিও তো এ জাতীয় সংবেদী সখ্যকেই মান্য করেছিলেন।

নকশাল আন্দোলন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সামনে ধরে দিয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। লক্ষ করা যায়, যাঁরা এ আন্দোলনের সঙ্গে কোনোদিক দিয়ে প্রত্যক্ষে যুক্ত ছিলেন না, তাঁদের কাছে এ আন্দোলনের অভিঘাত অনেকটা নৈতিক যন্ত্রণার আকারে দেখা দিল। শিল্পের দাবি মেটানোর ব্যাপারে বরং তারাই কিছু বা বেশি সফল। স্মরণ করতে ইচ্ছা হয় অসীম রায়ের 'অসংলগ্ন কাব্য', দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' হঠাৎ খবরের কাগজ থেকে টেনে নেওয়া ঘটনার গল্পায়ন নয়। গল্প আর সত্যের মধ্যে এখানে সীমারেখাটি প্রায় নেই। সেটাই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথাটি এটাই যে, এই কাহিনীর সাহায্যে এঁরা আমাদের সকলের ঘুমন্ত বিবেককে ধাক্কা দিলেন। আমাদের সম্বিতের জাগরণের সেই ভয়ংকর অনুভূতিটি সৃষ্ট হয় বলেই এ লেখা এত অব্যর্থ। সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' নকশালপন্থীদের ভালো না লাগার কারণ আছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের একাকীত্বের যন্ত্রণায় তা অনন্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' যেন একটি যৌবনের বিরাট অপচয়ের বেদনাকে তুলে ধরে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পায়ের তলার মাটি' গভীর নিবিষ্ট আন্তরিকতায় ভরা কাহিনী। সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'র অনিমেষ-মাধবী একটা সময়ের প্রতীক যুগল। অবিস্মরণীয় অসীম রায়ের 'অসংলগ্ন' কাব্য। 'কংগ্রেস সমর্থক' তারাশঙ্করে কাছ থেকেই পাওয়া গেল 'অরণ্যবহ্নি'র মতো উপন্যাস। সাঁওতাল বিদ্রোহ তার বিষয় বটে, কিন্তু রচনার প্রেরণামূল খুঁজতে হয় নকশালবাড়ির মাটিতে। তবে এ প্রসঙ্গে সবথেকে বিস্ময়কর চরিত্রমূর্তি মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের বসাই টুডু এবং কালী সাঁতরা। বাংলা উপন্যাসে বসাই টুডু ও কালী সাঁতরার মতো রাজনৈতিক চরিত্র দুর্লভ। বসাই একটা ব্যক্তি; বসাই একটা 'মিথ'।

বসাই জীবিত অথবা মৃত 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এই রণবাণীর জীবন্ত মূর্তি। শুধু তাই নয়—ব্যঙ্গে, বেদনায়, সংকল্পে এবং অপরাজেয়তায় সে সত্তরের দশকের মূর্ত প্রতীক। সে যখন কথা বলে, তখন ইতিহাসের গূঢ় সংকেত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

> ধান তো গান লয় কালীবাবু। আমাদের জাহান। চাষ পরধান দেশ আমাদের লয়? বীজ ফেলবু, চারা লাড়বু, খেত নিড়াবু, ধান কাটবু, টাহালে উঠাবু অন্যের, তা মূল গায়েন কর‍্যে যারা, তারাদের দেখল নাই কুন-অ সভা? তে—ভা—গা—। বহুৎ বড়া আন্দোলন! জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, চব্বিশ পরগণা লালে লা—ল। কৃষক সভা ভাগচাষীরে মদত দিলু। কিন্তুক কালীবাবু। ভাগচাষীরে মদত জুয়াল কারা? খেতমজুর ভাগচাষী লয়। কিন্তুক যায় নাই খেত-মজুর? মরে নাই গুলিতে?

এ কথার উত্তরে কালী সাঁতরার কিছু বলার নেই—সে নিরুত্তর—প্রাজ্ঞ সর্বদর্শী পরিণত ভীষ্মের মতোই সে নিরুত্তর। সে বলে—'কিছু বলার নাই'। ইতিহাস ধিক্কারময় তিরস্কারে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে বসাইয়ের কণ্ঠে—

> কেনী? নাই কেনী? বাবুদের সাথে মোর আর কথা হবেক নাই। এই শেষ। তবে কেনী তুমি কিছু বলানা? বলার নাই! হা রে বেইমানী!

বসাইয়ের থেকেও কালী সাঁতরা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে গভীর বেদনায়। কালী সাঁতরা ইতিহাসের ট্রাজিক বিষণ্ণতার বিগ্রহ। বসাইয়ের মতো ডাইনামিক সে নয়, কিন্তু তার ইন্‌ট্রোস্‌পেকশনে আছে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের যথার্থ আত্ম-সমালোচনা। পরিবারের দ্বারা অবজ্ঞাত, পার্টির দ্বারা অবহেলিত, যুবকদের কাছে কৌতুকের বিষয় কালী সাঁতরা যখন ভাবে:

> এখন তার সে সব কথা অবরে-সবরে মনে হয়, সেগুলি সৎকর্মীর জীবনের গোধূলিতে বড় মর্মান্তিক। ব্লকের কুয়ো থেকে ডোমরা জল নিতে পারে না দেখলে, অথবা বিধবা সহকর্মিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম্যস্কুল থেকে নিত্য-জীবন দলুইকে বিতাড়িত হতে দেখলে (বিধবাটি বামনী) কালী সাঁতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলিই বিফল হয়েছে—বিপ্লব এ দেশে গালভরা কথা বই নয়, পানের তবক মাত্র।

অথবা যখন ভাবে:

> মানুষ মানুষকে বোঝে না, পার্টি মানুষের সকল সত্তা নেয় অথচ পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ভালবাসা ও আন্‌ডারস্ট্যান্‌ডিং দিতে ভুলে যায়। ফলে মানুষ আরেকরকম আকাল তৈরি করে বহু মানুষের মনে।

তখন এই প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাসটি বসাই আর কালী সাঁতরাকে মিলিয়ে এক অবিভাজ্য অর্থঘনতা সৃষ্টি করে। কম বা বেশি আমাদের সকল বেদনার্ত সচেতনতার কালী সাঁতরা কথা বলছে।

খুব সম্প্রতি এই বিষয়ের বাতাবরণে লেখা শৈবাল মিত্রের একটি উপন্যাস আমরা পড়েছি। রচনাটি এখনও গ্রন্থাকারে বেরোয়নি। এক বিদেশিনী তরুণী এদেশের কৃষকসংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিলেন, 'হে মহাজীবন' উপন্যাসে সেই তরুণীর সমস্ত দহন ও দীপ্তিকে লেখক প্রায় প্রতীকী করে তুলেছেন।

ছোটো মাপের নানা উপন্যাসে জটিল সময়ের এক এক ভগ্নাংশের নিক্ষেপিত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা গত দশ বছরের উপন্যাস সাহিত্যের একটা লক্ষণ। এই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল রায়ের 'ধর্মান্তর' বা 'দায়বদ্ধ', 'রামচরিত', মতি নন্দীর 'শাদা খাম', দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' এবং 'স্বপ্নের ভিতর', রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ' এবং 'বাহিরি', হর্ষ দত্তর 'প্রবাল রঙের আলো', আবুল বাশারের 'সঈদা বাঈ', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'মুখোসের চোখে জল' প্রভৃতি। এই তালিকা প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি আফসার আমেদ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই এবং তরুণতম অভিজিৎ সেনগুপ্ত এবং ভগীরথ মিশ্রকে। আলাদা করে এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য মতি নন্দী এবং দিব্যেন্দু পালিত। এই জন্য এই দুজন লেখক পৃথক উল্লেখের দাবি রাখেন যে এরা ছোটো নভেলের শিল্পরূপটিকে একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন। এঁরা বোধ হয় বড়ো আয়তনের কিছু লিখতে তেমন তাগিদ অনুভব করেন না। সেটা দোষের কিছু নয়। বরং যখন দেখি এই নিজ প্রকরণের মধ্যে স্বয়ন্তর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থেকে মতি নন্দী তাঁর উপন্যাসের ভাষায় এবং স্বরক্ষেপণে এই জটপাকানো সময়গ্রন্থির দুশ্ছেদ্যতাকে ঠিকমতো ধরে দেন, দিব্যেন্দু ধরে দেন ব্যক্তিপাত্রের সর্বৈব অসহায়তার মধ্যেও তার ট্র্যাজিক উদ্দীপনাকে, তখন অন্য অনেকের পৃথুল উদ্দেশ্যহীনতার চেয়ে এঁদের লক্ষ্যবেধ নৈপুণ্যকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। মতি এবং দিব্যেন্দুর মধ্যে পার্থক্যও আমরা ভুলে যাই না। মতি অনেক বেশি নির্লিপ্ত, উদাসীন দ্রষ্টার মতো সময় ও নিয়তির হাতে সমর্পিত মানুষগুলিকে আঁকেন। দিব্যেন্দু এরই মধ্যে বুঝতে চান এক আধুনিক নৈতিক লড়াইকে। আমার বক্তব্যের সাক্ষ্যস্বরূপে এখানে 'স্বপ্নের ভিতর'-এর 'থিম'টি আলোচনার জন্য তুলে দিতে পারি। এই বইয়ের আসল কথা বিশাখা এবং অর্পিতার নিয়তি। সেটা শুধু বিশাখা আর অর্পিতারই নিয়তি নয়—এক হিসাবে

সচেতন ও সজাগ বিশ্বের সকল নারীরই নিয়তি। প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিকে প্রায় নেপথ্যে রেখে এই দুই নারীর প্রবল আত্মসমীক্ষাকে সাবয়ব করে তোলা হয়েছে। নারীর দেহাধীন নিয়তির সঙ্গে তার সংগ্রামে মূর্ত হয় একালের নারীর নৈঃসঙ্গ। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় অর্পিতা একাই এগিয়ে যাচ্ছে। বিশাখার এগিয়ে দেওয়া হাত সে ধরল না—'ধরার দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে পারবো'। একা, বিমর্ষ, তবু তার পা ফেলার ভুল নেই।

তথাপি বড়ো মাপের উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের সমাজ ও ব্যক্তিবীক্ষণ একটা সামগ্রিকতা পায়। গত কয়েক বৎসরে সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ো মাপের উপন্যাসে ইতিহাস, সময়, ব্যক্তি ও সমাজের বড়ো ক্যানভাস ব্যবহার করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' এবং 'পূর্ব ও পশ্চিম'-এ ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে ইতিহাসকে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দূরবীন'-এ তিনপুরুষের হিসাব-নিকাশে ব্যক্তির সম্পর্ক সংকটের জটিল রেখাপাতকে অভ্রান্তভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। সে অভ্রান্ততার মূলে রয়েছে শীর্ষেন্দুর ব্যক্তিপাত্রজ্ঞান ও কালচেতনার অন্যোন্য সাপেক্ষতা। জীবনের মধ্যে একটা শক্তি আছে যা শেষপর্যন্ত শুদ্ধতাভিমুখী—শীর্ষেন্দুর প্রধান উপন্যাসে এই নৈতিক সচেতনতা ক্রিয়াশীল থাকে। এটা তাঁর আনুকৌলবতা নয়। এ তাঁর স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার দান। 'এ জীবন নিয়ে কী করতে হয়' হেমকান্ত বা অন্য যে কোনো প্রধান চরিত্রের এই জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতকের প্রথম আধুনিক গদ্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরাধিকার। দিনে দিনে প্রজন্মে প্রজন্মে জটিলতা যত বেড়েছে এ প্রশ্নও তত তীক্ষ্ণতা পেয়েছে। 'দূরবীন' উপন্যাসে ধ্রুব চরিত্রটি এ প্রশ্নে প্রতিহত এক যুবকের প্রতিভূ। ধ্রুবর কোথাও যেন শিকড় নেই। কোনো কিছুর সঙ্গে তার যথার্থ আত্মীয়তা নেই। তার আদ্যোপান্ত অসংগতিই তাকে সবথেকে জীবন্ত করে তুলেছে। হেমকান্তের শান্ত মেদুর জীবন, কৃষ্ণকান্তের কঠিন কঠোর জীবনাচরণ—এবং ধ্রুবর অনিকেত ভাসমানতা, নিজেকে নিরুদ্দেশ অন্বেষা উৎসব সব মিলিয়ে এক বিচিত্র তিনপুরুষ —তিন স্তরে বিশিষ্ট ইতিহাস। ধ্রুবর আঘাতপরায়ণতা, তার মদ্যপান, তার উচ্ছৃঙ্খলতা সবকিছুই যেন এক প্রতিবাদ। রেমিকে দিয়ে ধ্রুবকে বুঝে নিতে গিয়ে আমাদের সমস্যা আরও বাড়ে বই কমে না। ধ্রুব নামকরণটিই যেন আজকের যুবকের অনিশ্চিত সংশয়ী এবং অবিশ্বাসী যুবজীবনকে তির্যক ব্যঙ্গ। আসন্ন সম্ভবা

রেমি কথাপ্রসঙ্গে ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি কি মঙ্গল গ্রহের মানুষ? কিছুই আমাদের মতো নয়?' এই প্রশ্নটা ধ্রুবকে শুধু নয়, হয়তো শিকড়হারা সকল যুবককে চিনিয়ে দেয়। জয়ন্তকে ধ্রুব বলেছিল তার একটা বড়ো ভুল হয়ে গেছে। ভুলটার ব্যাখ্যায় সে যা বলে তাতে বোঝা যায় তার একটা নিজের সম্বন্ধে হিসাব ছিল। ভুলটা হল—টু বি বর্ন ইন্ এ রং প্লেস্ অ্যাণ্ড ইন্ এ রং টাইম, অ্যাণ্ড ইন্ এ রং ফ্যামিলি। এ গরঠিকনিয়া মানুষটিকে লেখক কিন্তু উদাসীর মাঠে ছেড়ে দেননি। মানুষকে শেষপর্যন্ত মানুষের কাছে ফিরে আসতে হয়। বইয়ের একেবারে শেষে কৃষ্ণকান্তের চিঠি পড়ে ধ্রুব যখন উচ্চারণ করতে চাইছিল 'বাবা', তখন আমরা অনুমান করি গরঠিকনিয়া এবার বোধ হয় ঠিকানা পেয়ে যাবে। বোধ হয় নিজ আত্মজের সঙ্গে ধ্রুবর একটা সম্পর্ক এরপর গড়ে উঠবে। পূর্ব প্রজন্মের ভুল হয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে শুধরে নেওয়া যাবে। একটা বড়ো মানবীয় উৎকণ্ঠা ছাড়া একজন সার্থক ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না। শীর্ষেন্দু সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার দ্বারা বিদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমলেন্দু চক্রবর্তী 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাত্রা'য়, 'যাবজ্জীবন'-এ, 'একদিন প্রতিদিন'-এ নগরের বুকচাপা ধোঁয়াশার মাঝখানে খুঁজে দিতে চেয়েছেন অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণাকে এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন সেই যন্ত্রণাই তাঁর চরিত্র-গুলির প্রধান অভিজ্ঞান। চরিত্রজ্ঞান তাঁর অব্যর্থ এবং মোক্ষম—অথচ তা সম্পূর্ণ-ভাবে নভেলিয়ানামুক্ত। এজন্যই তাঁর উপন্যাসের ভাষা—এবং সেই সুবাদেই বলা যায় তার প্রতিটি উপন্যাসের টেকনিকজ্ঞান তাঁর বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণেরই সূচক হয়ে দেখা দেয়। টেকনিককে বক্তব্য অতিক্রমী করে ফেলার যে বিপদ তাকে তিনি সামাল দেন তাঁর সাধারণ-অসাধারণ অভিজ্ঞতার দৌলতে—জীবনের চলিষ্ণুতায় বিশ্বাসে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত একখানি উপন্যাসে জীবন ও শিল্পের একাকৃতি প্রমাণ করেছে বাংলা উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা ধারণের আগ্রহ এবং সামর্থ্য। তৃতীয় বিশ্বেই সম্ভব এমন বিস্তারিত পটভূমিতে সংহতি প্রগাঢ় উপন্যাস। উপন্যাসটির নাম 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'—লেখক দেবেশ রায়। দুপুরবেলায় বালিশে মাথা এলিয়ে পড়ার মতো উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নয়। এখানে সুখপাঠ্যতা নামক কুহক রচনার কোনো প্রয়াস নেই। বাঘারু আড়ে এবং দীর্ঘে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছে সতীনাথের ঢোঁড়াই-উত্তর এক নতুন চরিত্র কল্পনা। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে প্রধান কথা লেখকের নিজের ব্যক্তিগত স্বরকে চেপে আকাশ

মাটি জল পশু মানুষ সব মিলিয়ে এক জীবনপ্রতিমা গড়ে তোলা। সে ঐকতানে লেখকও যোগ দিয়েছেন বটে, কিন্তু তা বৃত্তান্তকার হিসাবে। পরিবর্তমান ভূপ্রকৃতি এবং আর্থসামাজিক পটে বাঘারুর অপরিবর্তনীয়তা আর ভাঙচুরের—বাঘারুর নতুন নতুন মূর্তির দ্বান্দ্বিকতা শ্রমনিষ্ঠ কবজিতে ও মেধাবী প্রত্যয়ে লেখক গড়ে তোলেন, হয়তো বা ভাস্করের পাথুরে কাজের সঙ্গেই তার তুলনা। আবার কখনও লোককথার প্রাণীণ উপাদানে প্রতিমায়িত হয় বাঘারুর একান্ত লৌকিক অথচ ব্যক্তিক অনুভূতি। বাঘারুর শারীরিকতা এবং প্রাণীণতার ছন্দকে দেশকালের তরঙ্গায়িত পটের সঙ্গে মিলিয়ে এ বৃত্তান্ত বিস্তার পায়। তার কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে চারিপাশের অন্বয়, অনন্বয়, সংঘাত, অভিঘাতের পরম্পরায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বাঘারুর মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের মূল স্বরটি লেখকের ভাষাতেই ভালো ধরা যায়—'বাঘারুর প্রতিটি দিনই এক একটা পুরো জীবন। প্রতিটি ভঙ্গিই তো বীরত্বের ভঙ্গি—সে নদী সাঁতরানোই হোক আর পাথরে শুয়ে থাকাই হোক, ভোখার সঙ্গে খেলাই হোক আর বুড়িয়ালের পিঠে দাঁড়ানোই হোক। সে মোষের বাচ্চা বের করাই হোক আর পাখির ডাক ডাকাই হোক।

ভাষা মানেই তো অর্থ। বাঘারুর তো কোনো অর্থ নেই। বাঘারুর তো শুধু বাঁচা আর, সে তো শুধু জীবন আর জীবন।

ভাষা মানেই তো কিছু না কিছু অলংকার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বাঘারুর সারা গায়ে, মাঝখানে একটা নেংটি ছাড়া সামান্যতম ঢাকা নেই। বাঘারুর তুল্য এমন নগ্ন ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

ভাষা মানেই তো নাম। বাঘারুর তো কোনো নাম নেই। সে তো শুধু কাজে কাজে বদলে বদলে যায়।—কুড়ানিয়া, বাঘারু, পাথুরিয়া মইষাল…তার এই হয়ে ওঠার তো আর শেষ নেই।'

অথচ প্রকৃতিলগ্ন এই মানুষটির চলা মানে পৌঁছোনো নয়, খোঁজা মানে পেয়ে যাওয়া নয়। মাটি খোঁড়া মানে জলে চুমুক দেওয়া নয়। তাই বাঘারু যখন একা একা পথ হাঁটে তখন সে গুনগুন করে। 'বাঘারুর দুই হাতে কখনো কোনো শিশু দোল খায়নি। আর এখন সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দোলানোর মতো শিশু যখন বাঘারুর হাতের মধ্যে নেই, তখন বাঘারু নিজেকেই দোলাক। এই রকম হাঁটতে হাঁটতে যতটা দোলানো যায় দোলাক। আর যতটা বিড়বিড় গুনগুন করা যায় করুক। বাঘারু এখন তার নিজেরই শিশু।' উঠেন উঠেন বেলাঠাকুর চিকমিক্যানি দিয়া—বাঘারুর এই আত্মনিমগ্ন লোকগান যেন প্রতিচ্ছায়া পায়

আকাশে—'আকাশের লাল রঙ ধুয়ে ঝকঝকে নীল রঙ বেরিয়ে পড়ে'। প্রকৃতি বনাম বাঘারু, পরিবর্তমান সমাজ বনাম বাঘারু, বাঘারু বনাম বাঘারু—দেখতে দেখতে মনে হয় আর সবই অলীক। মাদারিকে নিয়ে হাঁটতে থাকুন বাঘারু। বাঘারুই ভারতবর্ষ।

যে তৃতীয় ধারার উপন্যাসিকের দল সম্প্রতি আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এর আগে মাত্র উল্লেখ করেছি। বাঘারুর কথা বলার পর তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক দু-কথা বলা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এঁরা পাংশুল বৃত্তানুগমনে বা মধ্যবিত্তের নানা সংক্ষোভ ফ্রাস-ট্রেশনের কাহিনী ফাঁদেননি। এঁরা অনেকেই সেখান থেকে বিষয় ও বিষয়ার্থ সংগ্রহ করেছেন, যেখানে আলো এতদিন পৌঁচচ্ছিল না, বা পৌঁছলেও সে ছিল কতকটা শৌখিন আলো। দেবেশের বাঘারু, মহাশ্বেতার বসাই, সতী-নাথের ঢোঁড়াই সেই আলোর তোয়াক্কা করেনি। বাঘারু-বসাই-ঢোঁড়াই আলাদা আলাদা পটে ও পুরুষার্থে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করল, সাতের দশকের ঢেউ ও দমকা ঘূর্ণিতে ধাক্কা খাওয়া একগুচ্ছ নতুন লেখক সেই ঐতিহ্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে পৌঁছে যেতে চাইলেন তৃণমূলে। এঁদের কথা পৃথকভাবে বলার দায় আমরা এড়াতে পারি না। এখানে এই নতুন ধারার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করছি ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসটি লোকজীবন ও লোকায়ত মিথকে সামনে রেখে বসুশবরদের সংস্কৃতি-সংকট ও আর্থ-সামাজিক সংকটকে লেখক প্রতিমায়িত করেছেন এই উপন্যাসে। রাজীব আর ক্যাথিবার্ড-দের লোকসংস্কৃতি চর্চায় কোন্ অসংগতি, রাজীব কেমন করে নিজেই হয়ে গেল এক আত্মঘাতী আড়কাঠি—মধ্যবিত্ত শুভৈষণা কোন্ চোরাবালিতে ডোবে—রাজীবের সেই সর্বৈব ভূমিকা হারানোর আশ্চর্য আলেখ্য 'আড়কাঠি'। এ জাতীয় উপন্যাস আমাদের বলে জীবন অদম্য অফুরান—বলে, উপন্যাসই সেই দ্বান্দ্বিক দর্পণ, যাতে প্রতিফলিত হয় অস্তিত্বের উত্তরঙ্গ রূপ। তৃতীয় ধারার ঔপন্যাসিকেরা প্রধানত অণুপত্রিকার লেখক। সংঘবদ্ধতাকে না হলেও এই ধারার লেখকেরা একটি অলিখিত শিল্প-সনদে স্বাক্ষরদাতা। এঁদের মূল লক্ষ্য বাংলা কথাসাহিত্যকে দুটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করা। এক. রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির ছক-ভাঙা যন্ত্রণাকে স্বীকৃতি দান ; দুই. মহানাগরিক গণ্ডির বাইরের জীবনকে বাংলা

সাহিত্যে পুনর্বাসন। সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, আফসার আমেদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সেন প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের নাম এখানে আমরা মনে করতে পারি। 'চারণভূমি', 'রহুচাঁড়ালের হাড়', 'পিতৃভূমি', 'চতুষ্পাঠী', 'যক্ষ' এবং এই গোত্রের নানা উপন্যাস বাস্তব ভাষ্যের নতুন মাত্রা এনে দিচ্ছেন। পাংশুল টেকনিক চর্চায় নয়, বহুমাত্রিক জীবনকে সানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে বিদ্ধ করা এঁদের অভিপ্রায়। যে সাহিত্যিক ফ্যাশনের বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্রোহ, সে সাহিত্যিক বাজারমনস্কতার বিরুদ্ধে এঁদের অভিযান, সেই বিদ্রোহ এবং অভিযানকে যখন এঁরা বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত পরম্পরার সঙ্গে লগ্ন করে দিতে পারবেন, সেদিন এঁদেরও চরিতার্থতা, বাংলা উপন্যাসেরও নতুন মাটি খুঁজে পাওয়া।

বাংলা উপন্যাসের উষাদ্বিপ্রহর, তার বীজপাত, অঙ্কুরায়ন, শাখাপল্লবে বিস্তারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের জল মাটি ঋতু বদলের পূর্ণ অঙ্গীকার। সেই অঙ্গীকারে জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার অধ্যয়ন ফিরে ফিরে।

—